ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৯ সংখ্যা ।। ১৭ কার্তিক, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ৩ নভেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন

মোদীই কেন্দ্রবিন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তিনি চান বা না চান তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হতে চলেছে ভারতের রাজনীতি। গোধরার নারকীয় হত্যাকান্ড থেকে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ সবেতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে গুজরাট নরেশ মোদীর নাম।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হতে চলা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এবং অবিজেপি দলগুলির প্রচার কৌশলেও উঠে এসেছে মোদীর নাম। একদিকে কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা মোদীকে পুরোনো অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করতে গুজরাট

(এরপর ৪ পৃষ্ঠায়)

মুসলিমদের মন ভেজাতেই

‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদ’-এর তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে

গূঢ়পুরুষ ।। লোকসভা নির্বাচনের বেশি দেরি নেই। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণও ঘোষিত হয়েছে। এরপরেই মুসলিম ভোট দখলে আনতে মরিয়া কংগ্রেস ও বামপন্থী দলেরা একজোটে হিন্দু বিরোধিতায় সরব হয়েছে। সারা দেশজুড়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলছে কীভাবে সমস্ত হিন্দু সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করা যায়। দাবি জানানো হচ্ছে যে জয়পুর, আমেদাবাদ, দিল্লীতে সাম্প্রতিক ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইসলামি ছাত্র সংগঠন ‘সিমি’-কে নিষিদ্ধ রাখলে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও নিষিদ্ধ করতে হবে। এর জন্য হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ও দেশদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে আদালতে সাজানো মামলাও আনতে হবে। কংগ্রেস-বামপন্থী দলের ধারণা আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, জন জাগরণ মঞ্চ সহ সমস্ত হিন্দু ধর্ম ও স্বার্থরক্ষাকারি সংগঠনগুলিকে চলতি বছরে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নিষিদ্ধ করে রাখলে মুসলিম সমর্থন পাওয়া যাবে।

সোনিয়া-কারাত-লালু-মুলায়মদের হিন্দু বিরোধী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কতটা জাল ছড়িয়েছে তার প্রমাণ মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় মালেগাঁও ও গুজরাতের মোদাসাতে গত ২৯ সেপ্টেম্বর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জন

প্রজ্ঞা সিংহ

জাগরণ মঞ্চকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শাখা সংগঠন দুর্গা বাহিনী ও জন জাগরণ মঞ্চের স্বেচ্ছাসেবিকা সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ও পরিষদের দুই স্বেচ্ছাসেবক শ্যামলাল ভওরলাল এবং শিবনারায়ণ সিংহকে। এঁদের গ্রেপ্তার করেছে মুম্বাইয়ের গোয়েন্দা সংস্থা। যাকে ‘এন্টি টেররিস্ট স্কোয়াড’ বা এ টি এস বলা হয়। এই এ টি এসের দায়িত্বে থাকা মুম্বাই পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুখবিন্দার সিংহ সাংবাদিকদের বলতে পারেননি গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কী কী তথ্য ও প্রমাণ আছে। সুখবিন্দারের বক্তব্য, ‘আমরা যথাসময়ে আদালতেই তথ্য ও প্রমাণ দাখিল করবো’। আপাতত অভিযুক্তদের আরও জেরা করার জন্য ৩ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ পুলিশের কাছে তথ্য প্রমাণ নেই। এখন জেরা করার নামে ‘থার্ড ডিগ্রি’ প্রয়োগ করে মুচলেকা নেওয়া হবে যে তাঁরাই বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত ছিল। ইংরাজি দৈনিক ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ শুক্রবার ২৪ অক্টোবর ছয়ের পাতায় লিখতে বাধ্য হয়েছে, ‘‘পুলিশ ইভেসিভ অন হিন্দু আউটফিটস্ রোল’’। একটা কথা মানতেই হবে যে টাইমস অব ইণ্ডিয়া হিন্দু দরদি সংবাদপত্র নয়। ভারতের প্রায় সমস্ত বৃহৎ ইংরাজি দৈনিকগুলি আদতে বাম দরদি। সংসদে সি পি এম সাংসদরা আর এস এস সহ ভারতের সমস্ত হিন্দু সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করার জন্য তুমুল চিৎকার শুরু করেছে। সি পি এম সরাসরি বলছে এইসব হিন্দু সংগঠনগুলি আদতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। সি পি এম এইসব হাস্যকর কথা বলছে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সমর্থন পেতে। এইভাবেই মিথ্যা

(এরপর ৪ পৃষ্ঠায়)

নেপালে সেনাবাহিনীতে সশস্ত্র মাওবাদী জঙ্গিদের অন্তর্ভুক্তি হতে চলেছে

বিশেষ সংবাদদাতা।। রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র থেকে এবার উগ্র মাওতন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে নেপাল। উগ্র মাওবাদী নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ডের প্রতি মাওবাদী

সশস্ত্র জঙ্গিদের হুংকার, তাদেরকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে।

প্রসঙ্গত গত প্রায় দু-দশক ধরে বামপন্থী ভাবাদর্শের উগ্রপন্থী সংগঠন মাওবাদীরা নেপালের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে নেপাল জুড়ে। প্রথম দিকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে তাদের লুঠ-পাট, খুন, অগ্নিসংযোগ, বোমাবিস্ফোরণের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বজায় রাখলেও পরের দিকে তা শহরাঞ্চলে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণহরণ করে তারা। ধীরে ধীরে চীন সহ কয়েকটি দেশের সহায়তায় রাজতন্ত্র উচ্ছেদে সক্ষম হয়। মাওবাদী নেতা প্রচন্ডের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করতেও সক্ষম হয় তারা। সম্প্রতি সশস্ত্র মাওবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী নেপালের প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে সেনাবাহিনীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এদিকে সেনাবাহিনীর প্রধানের পদে প্রাক্তন এক মাও নেতাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিরোধীদের মধ্যে। অভিযোগ উঠেছে, সরকার প্রাক্তন গেরিলা কমাণ্ডার পাংসাকে নিয়োগ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। বিরোধীদের আরও অভিযোগ, পাংসাকে সরকার চীন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসারও সুবন্দোবস্ত করেছে। সরকারের এই স্বৈরাচারী মনোভাবকে ভালো চোখে নিতে পারছে না বিরোধী পক্ষ। অনেকের মতে, সেনার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকারের নিরপেক্ষ মনোভাব থাকা একান্ত জরুরি। এই ঘটনায় বিরোধী নেতা পারাজুলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, সেনাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের মধ্যে একটা চক্রান্ত রয়েছে সরকারি পক্ষের। ১৯ হাজার মাওবাদীকে সরকার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। তবে বিরোধী পক্ষের অবস্থান এ বিষয়ে কী হবে তা এখনও পরিষ্কার নয় সকলরে কাছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়নি।

আন্তর্জাতিক কূটনীতি মহলের মতে, আন্তর্জাতিক দরবারে একটা গণতান্ত্রিক চরিত্র তুলে ধরতেই এই নাটক। আসলে মাওবাদীদের দাবিই কার্যকরী হবে, এবং তালিবানদের পর নেপাল-ই সরাসরি জঙ্গিগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। নেপালের এমন অবস্থায় ভারত সরকারের ভূমিকা এবং ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি মৌনতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন আন্তর্জাতিক মহল।

রাজ্য জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলিম দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

দক্ষিণ দিনাজপুরের দিওড়ে দুর্গামণ্ডপ আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা তথা অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি পায়ে পা দিয়ে হিন্দুদের উপরে দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়ের মতোই আঘাত হানতে চাইছে। ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকে মুসলমান বহুল অঞ্চল বলে পরিচিত দিওড়ে বারোয়ারি দুর্গাপূজা মণ্ডপে গত ৬ অক্টোবর মহাসপ্তমীর রাত্রে বাতি নিভিয়ে প্যাণ্ডেলের পোলে সদ্যকাটা গরুর পা ঝুলিয়ে রেখে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় দলমত নির্বিশেষে দিওড় গ্রামের সকল হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এদিকে এরকম একটি ন্যক্কারজনক ঘটনার খবর খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেকে দিওড়ে ছুটে আসে এবং মহাসপ্তমীর শুভ সকালে মা দুর্গার সামনে মন্ডপের কাঠামোয় গরুর ঠ্যাং ঝুলতে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

এরকম একটি ঘটনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার আভাস পেয়ে প্রশাসনের কর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। তাঁরা ক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে কথা বলে অপরাধীদের গ্রেফতারের আশ্বাসও দেন। কিন্তু প্রশাসনিক

(এরপর ৪ পৃষ্ঠায়)

পূজা মণ্ডপে মুসলিম দুষ্কৃতীদের আক্রমণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধৃত নির্দোষ ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিতে দিওড়ের রাস্তায় মিছিল। (ইনসেটে মণ্ডপে গো-মাংস ঝোলানো)

অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার কথা বলায় সৌদির রাজাকে কোতলের ফতোয়া আল-কায়েদার

মুজফ্‌ফর হোসেন

মুসলিম জগৎকে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ মুক্ত করার জন্য সৌদি আরবের রাজা শাহ আবদুল্লা মক্কায় ইসলামি বিশ্বের পণ্ডিত এবং ইসলামি ধর্মীয় নেতাদের একটা বৈঠক ডেকেছিলেন। ওই বৈঠকে প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। সেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানকার মুসলিম নেতা তথা মোল্লা-মৌলভীরা, বেশ বড় সংখ্যায় হাজির ছিলেন। ইসলামি দুনিয়া মুখ্যত শিয়া এবং সুন্নী — দুভাগে বিভক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যখন কোনও ধর্মীয় আলোচনা হয় তখন শিয়ারা সুন্নীদের ডাকে না, সুন্নীরা শিয়াদের নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু সৌদির রাজা এদিকে খেয়াল রেখে ইরানের শিয়া নেতাদেরও ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রী আবদুল্লা ইরানের সবচাইতে বড় ইসলামি নেতাকে নিজে সঙ্গে করে মঞ্চে এসে উপস্থিত হন। সৌদি রাজা সেখানে এমন একটা ছাপ রাখতে চেয়েছিলেন যে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ থেকে ইসলামকে মুক্ত করানোর জন্য সমস্ত ইসলামি মতবাদীদেরই উপস্থিতি এবং ঐক্যমত দরকার। শাহ আবদুল্লার এই প্রচেষ্টার ভুরি ভুরি প্রশংসা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ সম্মেলন এই বিষয়ে প্রায় এক সুরে সমর্থন জানিয়েছে। মক্কা সম্মেলনের প্রভাব এতটাই পড়েছে যে তারপর প্রায় প্রত্যেক দেশেই এই ধরনের সম্মেলনের আয়োজন হতে দেখা গেছে।

শাহ আবদুল্লা ওই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় বলেন যে, মুসলমানদের ওপর এই অভিযোগ এই কারণে আরোপিত হচ্ছে যে ইসলামি বিদ্বানরা বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্ক করেন না। মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না করবেন এবং অন্যদের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত মেলামেশা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই জাতীয় অভিযোগ চলতে থাকবে। এর থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। শাহ'র বক্তব্য অনুসারে ইসলামের বিচারধারার সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য মুসলিম উলেমা এবং অন্যান্য ইসলামি নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। তারা বিভিন্ন ধর্মমতের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী দাগমুক্ত করানোর চেষ্টা করুন।

সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য মৌলানা এবং ইসলামি পণ্ডিতরা এক সুরে সুর মেলান

ঘাঁটিতে পরামর্শরত আল-কায়েদা সদস্যরা।

এবং বলেন যে এ পর্যন্ত ইসলামকে অন্যান্য ধর্মমতের সমাজ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেজন্য ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করা জরুরি যে ইসলাম শান্তি ও সহাবস্থানের ধর্মমত। এটা যে মুসলমানদের বাকীদের থেকে আলাদা করে ফেলেছে একথা ওই সম্মেলনে রীতিমতো বড় গলায় বলা হয়েছে।

এই সম্মেলনে এমন একটা আশা বাসা বেঁধেছিল যে, মুসলমান তথা ইসলামের ওপর অভিযোগের যে ছাপ লেগে গেছে সেটা থেকে এবার মুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। শাহ আবদুল্লার ওই বক্তব্যের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছেড়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কায়েদা। তারা এমনও ফতোয়া জারি করেছে যে 'এই ধরনের বক্তব্য রাখা শাহ আবদুল্লাকে কোতল করে ফেলা দরকার। ওকে হত্যা করাটা সাচ্চা মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। ইসলামি নেতাদের অন্য মতালম্বীদের সঙ্গে সম্পর্ক করার কোনও দরকার নেই। পৃথিবীতে সবচাইতে সাচ্চা এবং আচ্ছা ধর্মমত কেবলমাত্র ইসলামই। সেজন্য ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদকে যারা মান্যতা দেয় তারা ইসলাম বিরোধী। একমাত্র ইসলামই দুনিয়াকে সাচ্চা বানাতে সক্ষম। অন্য ধর্মমতের কোনও প্রয়োজন নেই।' তারা এও বলেছে যে, সমগ্র বিশ্বকেই আমাদের মুসলমান বানাতে হবে।

এর সোজা অর্থ হল অন্যান্য ধর্মমতের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি কারাটা হল ইসলাম বিরোধী কাজ, এখন শাহ আবদুল্লার মতোও শক্তিশালী কোনও নেতাকেই যদি কোতল করার হুমকী দেওয়া হয় তাহলে মুসলমানরা কীভাবে প্রমাণ করবেন ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয় না? এই পরিস্থিতিতে দুটো পথই খোলা থাকে। এক, আল্‌-কায়েদা এবং তালিবানের মতো সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করাটা মুসলমানদের প্রাথমিক এজেণ্ডা হোক। দুই, যে লোক এই ধরনের কথা বলে তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে এটা প্রমাণ করা হোক যে বাকী মুসলিম দুনিয়া তার সঙ্গে একমত নয়। এক্ষেত্রে সে যদি সংঘর্ষ করতে চায় তবে তার জবাব তারই ভাষায় দেওয়া দরকার। ঘটনা হল, সন্ত্রাসবাদীদের এই হুমকীর পরিপ্রেক্ষিতে কোনও মুসলিম নেতা কিম্বা মোল্লা-মৌলভী একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি। এই মৌন থাকার অর্থ কী?

শাহ আবদুল্লা অনেক সাহসের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক তথা ভাবে আদান প্রদানের কথা তো বলে দিলেন। কিন্তু যারা ইসলামের সিদ্ধান্তগত ভিতের সঙ্গে পরিচিত তারা তো একথাই বলবে যে শাহ আবদুল্লার বক্তব্য বাস্তবের সঙ্গে মিল খায় না। মুসলিম সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র বিশ্বকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। একটাকে তারা বলে দার-উল-হরব। অর্থাৎ যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। আর যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেটাকে বলে দার-উল-ইসলাম। দার-উল-হরবকে ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়ে দার-উল-ইসলাম বানানোটা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়ে থাকে। দার-উল-ইসলামে যেসব কায়দা-কানুন আছে তাতে অনেক রকমের ছুট থাকে। কিন্তু যেগুলো মুসলিম গরিষ্ঠ দেয় নয়, অর্থাৎ দার-উল-হরব সেখানে মুসলিম পার্সোনাল ল' অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করার কথা বলা হয়ে থাকে। সেজন্য সেসব দেশে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। কট্টরপন্থীদের বক্তব্য হল, মুসলমানরা সেই আইনই মানবে যা ইসলাম নির্দেশিত। সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনও নীতি রাখতে পারবে না। যদি ধর্মমতকে রাষ্ট্রের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে সংবিধান এবং সেখানকার সরকারের কোনও অস্তিত্ব বজায় থাকে না। এখন কথা হল, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক করার সময় এই ব্যাপারটার ফয়সালা করা হবে কীভাবে?

ইসলাম জেহাদকে তার অনিবার্য অঙ্গ মনে করে। মুসলমানরা যদি তাদের নিজেদের দেশের সরকারের বিরুদ্ধেই জেহাদের ফতোয়া জারি ও কার্যকর করে তাহলে সেখানকার সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে তাদের কীভাবে সম্পর্ক রক্ষিত হবে? সম্পর্ক তৈরির সময় তারা কি জেহাদের পরিভাষা বদলাবে? ভারতের উদাহরণ দেওয়া যাক। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের মুসলমানরা 'কাফের' সংজ্ঞা দিয়ে থাকে। এই অবস্থায় দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক রচিত হবে কীভাবে? কোনও সংখ্যালঘু এদেশে যদি রাষ্ট্রের চাইতে তার ধর্মমতকেই শ্রেষ্ঠতর মনে করে এবং দেশকে অবমাননা করে তবে সে কি সংখ্যাগরিষ্ঠের মন কখনও জিততে পারবে? সম্পর্ক হয় সমানে সমানে। মুসলিমরা তাদের নিজেদের ধর্মমতকে মহান বলে মানবে আর অন্যদের তাদের চাইতে হীন মনে করবে — এরকম হলে কোন্ সমাজ তাদের আপন করে বুকে টেনে নেবে? সুতরাং বলা যেতে পারে, ইসলামে যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়।

মালদায়

পূজা মণ্ডপে মুসলিম দুষ্কৃতিদের হামলা

সংবাদদাতা, মালদা ।। মালদা জেলাতে দুর্গা পূজাতে জঙ্গি হামলার মোকাবিলায় ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেও শহরের একটি পুজো মন্ডপে মুসলিম দুষ্কৃতীদের হামলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে মহাষ্টমীর রাতে। মালদা শহরের বিবেকানন্দ পল্লী পূজা কমিটির মণ্ডপে মদ্যপ অবস্থায় দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালায়, মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে। লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ এই দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করায় প্রথমে ক্লাবের সদস্যরা হতভম্ব হয়ে গেলেও পরে সমবেত ভাবে দুষ্কৃতীদের তাড়া করলে তারা পালিয়ে যায়। প্রতিমা ভাঙতে গেলে রনি সাহা রুখে দাঁড়ায়। তাকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে মাথা ফেটে যায় এবং ততক্ষণাৎ তাকে মালদা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর শহরের অন্যান্য পূজা কমিটিগুলি মুসলিম দুষ্কৃতীদের হামলার খবরে শান্তি ভারতী পরিষদ-এর নেতৃত্বে ৮-১০টি পুজো কমিটি সমবেত ভাবে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং তারা ওই রাত্রেই ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। নবমীর দিন দুপুরেও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ঘন্টাখানেক জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয় এবং ৪ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারের পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ডি এস পি শ্যাম সিং এবং ইংলিশবাজার থানার আই সি প্রসাদ প্রধান উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অষ্টমীর রাতে কয়েকজন যুবক মদ্যপ অবস্থায় মণ্ডপে এসে মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণ করে। ক্লাবের ছেলেরা প্রতিবাদ করলে তারাও রুখে আসে এবং তাদের মার-ধর করলে তখনকার মতো তারা চলে যায়, কিন্তু গভীর রাতে ৪০-৪৫ জন মুসলিম দুষ্কৃতী একসাথে মন্ডপে হামলা চালায়। পুজো কমিটির সম্পাদক চঞ্চল মৈত্র জানান, মীরচক থেকেই এই সব দুস্কৃতীরা পূজো মন্ডপে তান্ডব চালিয়েছিল। এদিকে রাজনৈতিক দলগুলি দুষ্কৃতীদের ছাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেনে পড়ে। সাংসদ আবু হাসেমখান চৌধুরী সহানুভূতি দেখানোর জন্য মন্ডপে মন্ডপে ঘুরে বেড়ান কিন্তু দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও কথা তার মুখ থেকে শোনা যায় নি।

অন্যদিকে ঈদের নমাজ পড়ার জন্য প্রতিবারের মতো এবারও জাতীয় সড়ক দু'ঘন্টা আটকে রাখা হয়। সুজাপুরের দুইদিকে সারি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। একটি অ্যাম্বুলেন্সে মালদা শহর থেকে কলকাতার মুমূর্ষু রুগী নিয়ে যাওয়ার পথে এইভাবে রাস্তা বন্ধ থাকায় ক্ষোভ জানালেও পুলিশ প্রশাসন রাস্তা মুক্ত করে রুগীটিকে পথ করে দিতে পারেনি। একইভাবে মানিক মিস্কীর কাছে গত তিন চার বছর ধরে রাস্তা বন্ধ করে নমাজ পাড়া হয়। অথচ পুলিশ প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা নেই।

সত্যানন্দ দেবায়তনে সরসঙ্ঘচালকজী

সুদর্শনজীকে বরণ করছেন স্বামী মৃগানন্দ। মাঝখানে বসে রয়েছেন মা অর্চনাপুরী।

সংবাদদাতা ।। গত ১১ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কলকাতায় ঠাকুর সত্যানন্দদেব-এর নামে যাদবপুরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী সত্যানন্দ দেবায়তনে আশ্রম প্রধান শ্রীশ্রী অর্চনাপুরী মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মতিলাল সোনী, বিভাগ সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপ্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী এবং এলাকার পৌরপিতা মলয় মজুমদার সহ কয়েকজন স্বয়ংসেবক। আশ্রমের পক্ষ থেকে সুদর্শনজীকে আরতি করে এবং পুষ্পমালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানান স্বামী মৃগানন্দজী মহারাজ। মৃগানন্দজী, মা অর্চনাপুরী এবং আশ্রমস্থ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দীর্ঘ এক ঘন্টাব্যাপী হিন্দুত্ব এবং দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সুদর্শনজী হিন্দুদের জয়যাত্রার বিভিন্ন ঘটনা, দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রচণ্ড আগ্রহ, সন্ন্যাসী ও স্বামীজীদের প্রতি সর্বসাধারণ শ্রদ্ধাবোধের ঘটনা জানান। শ্রীশ্রীঅর্চনাপুরী সরসঙ্ঘচালকজীকে 'বিজয়ী ভব' বলে আশীর্বাদ করেন। সকলে মিষ্টিমুখ করেই আশ্রম থেকে ফিরে যান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মিনি নির্বাচন

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী মাঝে-মধ্যেই দাবি জানাইতেছেন যে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার পুরো মেয়াদেই কাজ করিবে। কিন্তু মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি যেভাবে চাপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় এই সরকারের পুরো মেয়াদ শেষ হইবার আগেই লোকসভা নির্বাচন ডাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সংস্থা আকাশবাণী ও দূরদর্শন সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় দপ্তরের বিশেষ কিছু তৎপরতা এবং সর্বোপরি খোদ নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা দেখিয়া একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, ইউ পি এ সরকার তাহার পুরো মেয়াদ শেষ করিবার আগেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেক্ষেত্রে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন একপ্রকার অবধারিত বলিয়াই মনে হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, সিপিএম কর্তৃক বহু আলোচিত ও সমালোচিত ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তিটিও সম্পাদিত হইয়া যাইবার কারণে সরকার চাইছে সেই সাফল্যের প্রভাব থাকিতে থাকিতেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নামিয়া পড়া। প্রশ্ন উঠিয়াছে, চতুর্দশ লোকসভার চলতি অধিবেশনই কি শেষ অধিবেশন? অনুমান করা হইতেছে, এই অধিবেশনে ইউপিএ সরকার লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুন জনাদেশ চাহিবে। অবশ্য গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অকস্মাৎ দেশের অর্থনীতি যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে ইউপিএ সরকার দ্বিধার মধ্যে পড়িয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো ইউপিএ সরকার পাঁচ দিনের একটি অধিবেশন ডাকিয়া 'ভোট অন একাউন্ট' পাশ করাইয়া লইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্য পূর্ণ মেয়াদ শেষ করিয়া যথাসময়ে নির্বাচন হইবার সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যে লোকসভা ভোটের আগে মিনি ভোটের বাদ্যি বাজাইয়া দিয়াছে নির্বাচন কমিশন। বর্তমান লোকসভার আয়ু ২০০৯ সালের মে মাস পর্যন্ত। তাই ছয় মাস আগে নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাঁচ রাজ্যের এই নির্বাচনকে লোকসভা ভোটের সেমিফাইন্যাল বলা বোধ হয় খুব অত্যুক্তি হইবে না। এই নির্বাচনে হিন্দী বলয়ের চার রাজ্য এবং পূর্বোত্তরের এক রাজ্য রহিয়াছে। এই রাজ্যগুলি হইল দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং মিজোরাম। নির্বাচন হইবে জম্মু-কাশ্মীরেও। জম্মু-কাশ্মীরে এখন নির্বাচন করা লইয়া মতভেদ থাকিলেও একথা সবাই স্বীকার করিবেন, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির শাসন কখনও নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হইতে পারে না। এই নির্বাচন রাজনৈতিক দল ও জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের সামনে একটি বড় সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। নির্বাচন কমিশনের নির্ঘন্ট অনুযায়ী দিল্লী ও মিজোরামে ভোট হইবে ২৯ নভেম্বর। মধ্যপ্রদেশে ভোট হইবে ২৫ নভেম্বর। রাজস্থানে ৪ ডিসেম্বর এবং ছত্তিশগড়ে দুই দফায় — ১৪ ও ২০ নভেম্বর ভোট হইবে। এইসব রাজ্যের ভোট গণনা হইবে ৮ ডিসেম্বর। জম্মু-কাশ্মীরে সাত দফায় — ১৭ নভেম্বর হইতে শুরু হইয়া ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন পর্ব শেষ হইবে। ভোট গণনা হইবে ২৮ ডিসেম্বর। অর্থাৎ ২০০৮ সালের মধ্যেই দেশের নির্বাচনী রাজনীতির গতি-প্রকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে বর্তমানে বিজেপি ক্ষমতায় রহিয়াছে। দিল্লীতে ক্ষমতায় কংগ্রেস। মিজোরামে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট এখন শাসক দল। জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতেছে। প্রতিটি রাজ্যেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট সক্রিয় হইতে দেখা যাইতে পারে। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্বোত্তরের মিজোরাম বাদে বাকি চারটি রাজ্যই হিন্দীভাষী এলাকায়। হিন্দী বলয়ে বিজেপি সাধারণত বিশেষ জনপ্রিয় দল। কাজেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট পড়িলেও বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

অন্তত নয়াদিল্লীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল তাহাই মনে করিতেছেন। অন্যদিকে কিন্তু এই একই মহল মনে করিতেছেন যে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া কার্যকরী হইতে পারে। কেননা বিগত বছরগুলিতে দিল্লীতে শীলা দীক্ষিতের সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মোটেই রূপায়িত করিতে পারে নাই। বিশেষত জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধে দিল্লীর সরকার যেমন উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করিতে পারে নাই, তেমনই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করিবার ব্যাপারেও কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। এইবার কংগ্রেসকে রাজ্যটি হারাইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। সেখানে সম্ভাব্য বিজয়ী দলের নাম হইল বিজেপি। মনে রাখিতে হইবে, দিল্লী একসময় বিজেপি-র 'শক্ত ঘাঁটি' বলিয়া পরিচিত ছিল। এমনকী কেন্দ্রে কংগ্রেস জমানার সময়েও দিল্লীতে বিজেপিই জয়ী হইত। মিজোরামে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট উল্লেখযোগ্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ওই রাজ্যে বিজেপি জয়ী হইবে বলিয়া দাবী করিলেও শেষ পর্যন্ত ওই রাজ্যে বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরাতে সিপিএম নেতৃত্বাধীন জোট শাসন করিলেও এই পাঁচ রাজ্যে সিপিএমের কোনও প্রভাব নাই। কিন্তু তবুও সিপিএম এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে যে, এই মিনি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে না বলিলেও আভাসে ইঙ্গিতে বলিতেছে যে বিজেপি-ই জয়ী হইবে। কিন্তু কংগ্রেস বা বিজেপি যে-ই জয়ী হউক না কেন, তাহাতে সিপিএম কিংবা বামদলগুলির কোনও লাভ নাই।

চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় কোনও দলই আন্তরিক নয়

দেবব্রত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি কথা আজ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে। সেটি হচ্ছে শিল্পায়ন। সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন "কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ"। কিন্তু শিল্প গড়তে তো প্রথমে জমি লাগে। তাই শিল্পের জন্য জমি দখল নেওয়া নিয়ে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর আজ এক ইতিহাস। সরকার ও বিরোধীপক্ষ-উভয় দলের লোকেরা আজও ছুরি শানাচ্ছে। এই দুই অঞ্চলের জমি নিয়ে বিশেষ করে সিঙ্গুরের জমি টাটা মোটর্স-কে কারখানা করতে দেওয়াতে গত দু'বছর ধরে কখনও অনশন কখনও ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ, ধর্ণা প্রভৃতি আন্দোলন আজ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে বহুচর্চিত কাহিনী।

কিন্তু আজ গ্রামবাংলার মানুষের কাছে প্রশ্ন, সিঙ্গুরের ৯৯৭ একর এবং পরবর্তীকালে নেমে ৪০০ একর জমির জন্য যারা আন্দোলন করছে তারা কি সত্যি সত্যি পশ্চিমবঙ্গের চাষীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলন করছে? আজ এই আন্দোলন কি গ্রাম বাংলার চাষীদের কাছে "গোড়া কেটে আগায় জল" ঢালা নয়।

নদীমাতৃক দেশ আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ। নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আমাদের গ্রামজীবন। নদীর পাড়ে ঘর-বাড়ি-বাজার-স্কুল-মন্দির এমনকী কৃষি জমি, এই তো বাংলা। কিন্তু এই নদী যখন রাক্ষসীর রূপ ধরে তখন বিপর্যস্ত হয় গ্রামবাংলার জীবন। নদীকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠা মানুষগুলো হারায় ঘর-বাড়ি ও তাদের উপার্জনের কৃষি জমিও। পশ্চিমবঙ্গে বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপিণী পদ্মা-গঙ্গা-তোর্ষা-মহানদী-টাঙ্গন-রূপনারায়ণ-কেলেঘাই ইত্যাদি নদীগুলি প্রতিবার গ্রাস করে চলেছে পাড়ের গরীব গ্রামীণ চাষী মানুষগুলির সাজানো জীবন। প্রতিবার সরকার ভাঙ্গন রোধের প্রতিশ্রুতি নিয়ম করেই তলিয়ে যায় নদীর অতলে। কোনও হেলদোল নেই সরকার ও বিরোধী দলগুলোরও। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের চাষীর জন্য আছে আশ্বাস-অথবা কান্না নয়ত আন্দোলন ধর্ণা অনশন, অর্থের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু নদীর ভাঙ্গনে জমিহারা মানুষগুলোর জন্য কে আছে— কোনও দল এগিয়ে আসছে? প্রতিকারের জন্য কে অনশন করছে? কোন দল রাস্তা অবরোধ করে ধর্ণা দিচ্ছে? গ্রামের এই মানুষগুলি শহর থেকে অনেক দূরে থাকে। তাই খবর নেওয়ার দরকারও বোধ করে না সরকার তথা বিরোধী দলগুলি। শুধু এদের দরজায় হাত জোড়করে দাঁড়ায় ভোটের সময়। তাই নয় কি?

মালদা মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা হুগলী বর্ধমান জলপাইগুড়ি হাওড়া কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর — পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলার মধ্যে ১০ জেলায় প্রত্যেক বার বর্ষায় ভায়াবহ ভাঙ্গনে তলিয়ে যাচ্ছে কয়েক হাজার একর বাস্তু ও কৃষিজমি। আশ্রয় ও সাহায্য দানের ক্ষেত্রে ভরসা সেই অদেখা 'ঈশ্বর'। অথচ নদীপারের মানুষগুলো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নিজের পরিবারের ও শহর গঞ্জের মানুষের অন্নসংস্থানের বাধ্যকতায় জীবন গড়ে তুলে নদীকে কেন্দ্র করেই। তাদের এই করুণ অবস্থা কিন্তু বিচলিত করে না কোনও রাজনৈতিক দলকেই। এটাই আশ্চর্য। জেলাওয়ারি হিসেব দিয়ে পাঠকদের জ্ঞাত করতে চাই এই লেখার মাধ্যমে।

এই বছর মালদা জেলার পঞ্চানন্দপুর এলাকায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় গঙ্গার ভাঙ্গন। ৫৬৫টি দোকান সহ ১০টি গ্রামের প্রায় ৬৮৫টি পরিবার তলিয়ে গেছে।

> **"বাংলা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে গিনিপিগ। কেউ বাংলাকে ভাগ করে পাচ্ছে দিল্লীর সিংহাসন, কেউ বাংলার বৃহৎ শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পকে শ্মশানে পাঠিয়ে হচ্ছে জনদরদী সরকার। কেউ ভোট দখলের লোভে ধর্ণা অবরোধ হাঙ্গামার সিরিয়াল করে চলেছে, কিন্তু বাংলার চাষীর জন্য কারোও চিন্তা নেই।"**

তিরিশ বছর ধরে সেচ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ভাঙ্গনের কাজ হলেও ভাঙ্গন কবলিত এলাকার মানুষগুলি প্রশাসনের কাজে সন্তুষ্ট না হওয়ায় ২০০৪ সালে গঙ্গাভাঙ্গনের পর কেন্দ্রীয় সরকারের ফরাক্কা ব্যারেজের কর্তৃপক্ষ কাজ বন্ধ করে দেয়। এলাকার অধিবাসীদের মতে প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে কাজ করলে ভাল হয়, কিন্তু প্রশাসন বর্ষাতেই কাজ শুরু করে। ফলে আখেরে গ্রামবাসীদের লাভ কিছুই হয় না কিন্তু ফয়দা হয় বশংবদ কন্ট্রাক্টার ও সেচ দপ্তরের বেশ কিছু অফিসারদের। আর স্ফীতকায় হয় পার্টির ফান্ড।

মুর্শিদাবাদের একদিকে ভাগীরথী অন্যদিকে পদ্মা। পদ্মা-ভাগীরথীর ভাঙ্গনে হারিয়ে গেছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি ফসল ক্ষেত ও জনবসতি। এছাড়াও ভৈরব, জলঙ্গী, ভাগীরথীর গ্রাসে তলিয়ে গেছে ৫৬০০ হেক্টর জমি। গঙ্গা-পদ্মা ভাঙ্গনে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমি নদীগর্ভে গেছে। ২৫০০ গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ৯০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে। তবুও সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলির কোনও হেলদোল নেই। রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের তেঘড়ি অঞ্চলে পদ্মা-ভাগীরথীর মধ্যে মাত্র ১৫০০ গজের দূরত্ব রয়েছে। যে কোনও সময় এক বিরাট বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। এতে শুধু মুর্শিদাবাদের ক্ষতি হবে না, পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক রূপরেখাও পাল্টে যাবে। কিন্তু সরকারও চুপ, জেলার ডাকসাইটে নেতারাও কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেনা। অপেক্ষা করছে কখন কোন্ বিপর্যয় আরও নেমে আসবে— শুরু হবে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার খেলা। আজকের মুর্শিদাবাদের রবিনহুড়-এর রাজনৈতিক নেতা হিসাবে উঠে আসা তো এই নদী ভাঙ্গনের কৃপায়। তাকে এই সুযোগ করে দিয়েছিল প্রথমে বামফ্রন্ট, পরে কংগ্রেস। এবার দক্ষিণবঙ্গের বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ-সন্দেশখালি এবং মিনাখাঁ অঞ্চলের কথায়, বসিরহাট মহকুমা শাসক অপালা শেঠ মহাশয়ার কথায় এই মহকুমার ১০ ব্লকই বাঁধ ভাঙ্গায় সর্বস্বান্ত। সব মিলিয়ে ৪১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪ হাজার ৬৪৭ হেক্টর ভেড়ি ও চাষের জমি ডুবে গিয়েছে। এই চাষের উপর নির্ভরশীল "চাষাভুষা" গুলো আজ ঈশ্বর ভরসায় নির্ভরশীল। সিঙ্গুরের ৯৯৭ একর জমি নিয়ে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দলগুলি লড়াই যাত্রা দলের "টিনের তলোয়ার" নামক এক যাত্রাপালা। সত্যি কি দরদ আছে রাজনৈতিক দলগুলির হুগলিবাসীদের প্রতি? স্যার আশুতোষের গ্রাম বলাগড় ব্লকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরে। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরেই এ সমস্যা চলছে। সরকারি মহলের ও রাজনৈতিক দলগুলির অজানা নয় এ কাহিনী। চাষযোগ্য জমি থেকে শুরু করে বাগান বাড়ি বসতবাড়ি স্কুল সবই গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। যতদিন যাচ্ছে ভাঙ্গন ততই গ্রাস করছে গরীব চাষীদের চাষজমি ও বসতবাড়ি। বহু আবেদন করেছে স্থানীয় লোকরা, প্রশাসন নিশ্চুপ। বলাগড় ব্লকের গুপ্তিপাড়া থেকে বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার ভাঙনের শিকার হয়েছে। সুলতানপুর গ্রামের শ্মশান সহ বহু কৃষিজমি গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা সুসাম্য ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন, তাঁর ১২ কাঠা জমি এক বছরে তলিয়ে গেছে। এবার অপেক্ষা করছে তার বসতবাটি। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের অধিবাসীদের সমস্যা নিরসনের জন্য আছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, আছে স্থানীয় প্রশাসন, আছে সেচ ব্যবস্থা। প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয় ভাঙ্গন থেকে জমি বাঁচানোর জন্য। চাষীদের জমি সুরক্ষার জন্য, সে জমি রামের হোক অথবা রহিমের। কিন্তু রাজ্যে চিন্তা শুধু নন্দীগ্রাম আর সিঙ্গুরের চাষীদের জন্য। এ এক রহস্য। নদীমাতৃক রাজ্য পশ্চিমবাংলা আবার নদীই এ রাজ্যের আতঙ্ক। স্বাধীনতার ৬১ বৎসর পরও রাজ্যবাসীকে সরকার এই আতঙ্কের

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

মঠ আবিস্কার

প্রায় দু'হাজার বছরের পুরোনো বৌদ্ধ মঠ আবিস্কার করে দেশের প্রত্নতাত্বিক ভান্ডারকে গৌরবান্বিত করল গুজরাটের দক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক দফতর। ৫৫ বাই ৫৫ ফুটের বৌদ্ধ মঠটি তৈরি হয়েছিল ইট দিয়ে। সন্ন্যাসীদের থাকার সু-বন্দোবস্ত যুক্ত এই মঠের আবিস্কারে সাধারণ মানুষের পাশপাশি প্রত্নতাত্বিক দফতরও আনন্দিত। মঠটি দ্বিতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত বলে জানা গেছে। দীর্ঘ ২ বছর ধরে খনন কার্য চালানোর পর তা আবিস্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিউয়েন সাং ভাবনগরে যে ১০টি প্রাচীন বৌদ্ধ মঠের উল্লেখ করেছিলেন এটি তারই একটি বলে প্রত্নতাত্বিক দপ্তরের অনুমান।

বিবাহ বিভ্রাট

মুসলিমদের বহু বিবাহের পরম্পরাকে ভেঙ্গে দিল অস্ট্রেলিয়া। মুসলিমদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা চালু থাকলেও এবার থেকে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে থেকে তা সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, তাদের বহু বিবাহ প্রথাকে গর্হীত অপরাধ হিসাবেও মনে করা হচ্ছে সে দেশে। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাটর্নী জেনারেল রবার্ট মেকলেন্যন্ডন-পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন 'মুসলিমদের বহু বিবাহকে কখনই বৈধ হিসাবে মানা হবে না। এটা পুরোপুরি আইন বিরুদ্ধ কাজ'। মুসলিম সমাজ অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করার কোনও সাহস দেখাতে পারেনি।

রবীন্দ্র স্বাদ

এবার রবীন্দ্র সাহিত্যের স্বাদ পাবেন ইতালির বাংলা ভাষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। ইতালির ১১টি প্রথম সারির অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ানো হবে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। এবিষয়ে ইতিমধ্যে ইতালির বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও হয়েছে। ইতালির ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা খুব শীঘ্র কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 'মউ' স্বাক্ষর করবেন বলেও জানা গেছে। ইতালিতে রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ানো হলে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতে না এসেও সেই স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে বলে মনে করছেন বুদ্ধি জীবীমহল।

প্রাচীন শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল গুজরাত সরকার। গুজরাতের শিক্ষামন্ত্রক বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষার পরিবর্তে খুব শীঘ্রই প্রাচীন যোগ শিক্ষার পাঠক্রম চালু করতে চলেছে। ইতিমধ্যেই কোন কোন শ্রেণীতে কী কী পাঠ্যক্রম রাখা হবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। পাঠ্যসূচীর মধ্যে থাকছে ২০ টি প্রার্থনা, অষ্টাঙ্গযোগ, যোগাসন, সূর্যনমস্কার সহ ১২ প্রকারের যোগের অভ্যাস। যৌন শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচীন মুনি ঋষিদের সৃষ্ট যোগের পাঠ্যসূচী প্রধানমন্ত্রীত্বের যোগ্য দাবিদার বলে রায় দেন।

চালুর সিদ্ধান্তে রাজ্যবাসীও খুশি। অনেকের মতে এতে ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিক ও দৈহিক-দু দিক থেকেই উপকৃত হবে। রাজ্যের বুদ্ধি জীবীমহলও সরকারের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

সর্বনাশা ক্যান্সার

ক্যান্সার আক্রান্ত এবং দেশজুড়ে ক্যান্সারে মৃতের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি আগরতলায় ক্যান্সার নিয়ে এক জাতীয় আলোচনা সভায় বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞগণ বলেন, প্রতিবছর দেশে প্রায় নয় লক্ষ ক্যান্সাররোগী সনাক্ত হচ্ছেন এবং প্রায় লক্ষ লক্ষ রোগী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। আক্রান্তের মধ্যে চল্লিশ শতাংশই তামাক জাতীয় বস্তু থেকে আক্রান্ত। এই মুহূর্তে এই সর্বনাশা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা না হলে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত ব্যক্ত করেছেন।

সঠিক চয়ন

দেশের বর্তমান রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির ভাবমূর্তিই যুব-সমাজের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় বলে রায় দিলেন দিল্লীর প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনীয়ারিং ও এম বি এ-র ছাত্র-ছাত্রীরা। সম্প্রতি এই ধরনের ছাত্রদের সঙ্গে দিল্লীর এক প্রেক্ষগৃহে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে বসেন আদবানি। আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আদবানিকে কতটা মেনে নেওয়া যায় এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় নববই ভাগ ছাত্র-ছাত্রী আদবানিকে সফল রাজনীতিবিদ হিসাবে বর্ণনা করেন। এবং

'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তত্ত্ব

(১ পাতার পর)

অভিযোগে তসলিমাকে কলকাতা থেকে সি পি এম তাড়িয়ে ছিল। উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চায়েত মুসলিম ভোট পাওয়া। তবে সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

মালেগাঁও ও মোদাসায় বোমা অথবা বিস্ফোরক রাখা ছিল মোটরবাইকে। অন্তত পুলিশ তাই বলছে। এর মধ্যে মোদাসায় যে বাইকে বোমা রাখা ছিল তার সিটে ইসলামিক স্টিকার লাগানো ছিল। মুম্বাই পুলিশ বলছে মোটরবাইকটি সাধবী প্রজ্ঞা সিংহের। এ কথা সত্যি যে ১৯৯৭ সালে তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেত্রী হিসাবে ঘোরাফেরার জন্য একটি স্কুটার ব্যবহার করতেন। পরের বছরেই তিনি সেই স্কুটারটি বিক্রি করে দেন। এই বিক্রির কাগজপত্র রেকর্ড সবই আছে। স্কুটার এবং মোটরবাইকের মধ্যে পার্থক্য আছে। মোদাসার বিস্ফোরণের তদন্ত করছে সুরাত পুলিশ। এই তদন্তকারি দলের কাছে কোনও প্রমাণ নেই যাতে বলা যেতে পারে বাইকটি সাধবী প্রজ্ঞা সিংহের। কোন তথ্যের ভিত্তিতে মুম্বাই পুলিশ বাইকটি সাদ্ধীরই বলে দাবি করছে তা জানতে চেয়েছে সুরাত পুলিশ। শ্যামলাল ভওরলাল ও শিবনারায়ণ সিংহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারণ মুম্বাই পুলিশ বলছে মোদাসার বিস্ফোরনের পর তাঁরা প্রজ্ঞা সিংহের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। অর্থাৎ দেশের কোথাও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে সেদিন টেলিফোনে কোনও কথা বলা যাবে না। কথা বললে সন্ত্রাসবাদী বলে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে সাধবীর সঙ্গে তাঁদের কী কথা টেলিফোনে হয়েছিল তার কোনও রেকর্ড মুম্বাই পুলিশের কাছে নেই। যে তথ্য আছে তা হলো মোবাইল ফোনে তাঁরা মোট কতটা সময় ওইদিনে কথা বলেছিলেন। এর থেকেই মুম্বাই পুলিশ বুঝে গেছে যে বিদ্যার্থী পরিষদ, দুর্গা বাহিনী, জন জাগরণ মঞ্চ হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণেও এই তিনজনকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আগে মুম্বাই পুলিশের নাসিক ইউনিট দাবি করেছিল মালেগাঁওয়ের বিস্ফোরনের নেপথ্যে আছে সিমি বা ওরফে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। কারণ, জয়পুর, আমেদাবাদ ও দিল্লীর বোমা বিস্ফোরণের চরিত্র ও পদ্ধতির সঙ্গে মালেগাঁওয়ের বিস্ফোরণের যথেষ্ট মিল আছে। মালেগাঁওতে বিস্ফোরণ বোঝাই বাইকটি রাখা ছিল একটি বহুতলের একতলায়। একদা এই বাড়ির দোতলায় সিমির অফিস ছিল। মুম্বাই পুলিশ এখন বলছে বন্ধ হয়ে যাওয়া সিমির অফিস উড়িয়ে দিতেই বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা এখানে বোমা রাখে।

এর থেকে হাস্যকর যুক্তি আর কী থাকতে পারে। মালেগাঁওতে এর আগে ২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেদিন ছিল শুক্রবার। স্থানীয় মসজিদে নামাজ চলছিল। বিস্ফোরণে ৫ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হয়। এই ঘটনায় পরে নুর উল হুজা নামে সিমির এক উগ্র কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজও সে জেলে বন্দি আছে।

দিওড়ে দুর্গা মণ্ডপ অপবিত্র

(১ পাতার পর)

কর্তাদের মৌখিক আশ্বাসে অবিশ্বাসী জনতা দিওড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পার্শ্ববর্তী বাউলেও দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে ১০ নং রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। পুলিশ বেধড়ক লাঠি, গুলি চালিয়ে এবং টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটিয়ে দিওড়ে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। বাউলে শান্তিপূর্ণভাবে পথ অবরোধকারী জনতার ওপর পুলিশ ও র‍্যাফ নির্মমভাবে লাঠি চালানোই কেবল নয়, গৃহস্থ বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে বাড়ির মানুষদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাদের নির্যাতনের হাত থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধাও রেহাই পায়নি। পুলিশ দিওড় ও বাউল থেকে ৪৭ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করে কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট থানায় নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ওইদিন রাতে বালুরঘাট থানার লক আপেও পুলিশ প্রচন্ড নির্যাতন করে। এই নিরীহ হিন্দুদের ওপর জামিন অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করে সকলকেই বালুরঘাট জেলে পাঠিয়ে দেয়। অথচ প্রশাসন এখনও পর্যন্ত একজনও মুসলমান দুস্কৃতীকারীকেও গ্রেফতার করতে পারেনি। ফলে কেবল দিওড় বা বাউলেই নয় গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সচেতন হিন্দুদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। দিওড়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিওড় ও বাউলসহ গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওইদিন সন্ধ্যা ছয়টায় বালুরঘাটে ডি এম অফিসে এক শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠকে জেলার দুই মন্ত্রীসহ প্রশাসনিক কর্তারা এবং জেলার প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিজেপি ধৃত নিরপরাধ হিন্দুদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানায় এবং কংগ্রেসের দু'একজন নেতা তা সমর্থন করে। কিন্তু সিপিএম, আর এস পি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। উল্টে তারা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশের একপেশে হিন্দু বিরোধী কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে। ফলে বাঙালি হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার আনন্দের দিনে নিরপরাধ ৪৭ জন হিন্দুর মুক্তির বিষয়টি চাপা পড়ে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি সম্ভব নয় এবং এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে ওইদিন গভীররাতে পুলিশের উত্তরবঙ্গের আই জি দিওড়ে যায় এবং অপবিত্র পূজামণ্ডপে পূজা করতে অরাজি পূজা কমিটিকে শর্ত সাপেক্ষে রাজি করে পূজা অনুষ্ঠান করার এবং এলাকায় বলপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এছাড়া মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা আশ্রমে দুর্গাপূজা ধুমধাম সহকারে করার জন্য আশ্রমধ্যাক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দকে সিমি'র নামে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ নিয়ে রাজ্যের হিন্দুমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে। স্বামী প্রদীপ্তানন্দ পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় বিশেষত হিন্দুদের কাছে সুবক্তা, হিন্দুসংগঠক, নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা বলেই সমাদৃত। এই ঘটনাই আবারও প্রমাণ করছে যে, নিষিদ্ধ সিমি মুসলমান প্রধান মালদা, দুই দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় অত্যন্ত সক্রিয়। এর আগেও সিমির পক্ষ থেকে পাকিস্তানী পতাকা তোলা হয়েছিল ১৪ আগস্ট তারিখে কয়েক বছর আগে। তখন কিছু কট্টরপন্থীকে গ্রেপ্তার করেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের প্রশ্রয়েই কট্টর সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থী মুসলমানদের এতটা সাহস বেড়েছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত।

কেন্দ্রবিন্দু মোদী

(১ পাতার পর)

দাঙ্গার রেকর্ড বাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপিও মোদীর উন্নয়ণ, প্রশাসনিক সাফল্য ইত্যাদির অনুকরণ নিয়ে প্রচারে নামতে চলেছে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরারাজের মতে, রাজস্থানে একাধিক জনসভায় মোদীর উন্নয়নের ইমেজকে কাজে লাগাতে চান তিনি খোদ মোদীকে হাজির করিয়ে।

ছত্তিশ গড়ের মুখ্যন্ত্রী রমণ সিংয়ের বিবৃতি অনুসারে তিনি এবার কার্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি এমন বিধায়কদের মোদীর ঢঙে ছুটি দিতে চান। এমনকি দলীয় শৃঙ্খলারক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপত তিনি।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মতে, আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে মোদীর কৌশলই এবার কার্যকরী হবে। তিনি একাধিক জনসভায় মোদীকে প্রচারে আনতে চান।

দিল্লীতেও সফল ও শক্ত-সমর্থ প্রশাসন সঞ্চালনের অগ্রদূত হিসাবে মোদীকে হাজির করানোর কথা ভাবছেন বিজয় মালহোত্র, অরুণ জেটলির মতো নেতারা।

বসুন্ধরারাজে সিন্ধিয়ার বক্তব্য অনুসারে উন্নয়ণের আবহে জাতিবিদ্বেষ দূর করার বার্তা ছড়িয়ে দিতে তিনি মোদীকে রাজস্থান জুড়ে ঘোরাবেন।

অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ইতিবাচক ইস্যু হীন বিরোধী দলগুলিও প্রচার কাজে ইসু হিসাবে মোদী বিরোধিতাকেই সম্বল করে মাঠে নামতে চাইছেন। কেননা তাদের কাছে আর কোন ইস্যু নেই।

চাষীদের স্বার্থ রক্ষায়

(৩ পাতার পর)

থেকে মুক্তি দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। চীনের দুঃখ ছিল "হোয়াং আবং হো" নদী। একদিন ছিল চীনের ৪০ হাজার পরিবারের জন্ম মৃত্যু সবই এই নদীতেই হতো। সেই নদীকে বাঁধ দিয়ে চীন আজ এই নদীর পাড়ে গড়ে তুলেছে বিশ্বের অন্যতম শিল্প নগরী সাংহাই আর পশ্চিমবঙ্গের জন্য দরদী চাষীর বন্ধু (?) পারলো না তার ৩২ বৎসরের রাজত্বে সেচ দপ্তরকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে চাষীর জমিকে নদী গ্রাম থেকে রক্ষা করতে। বাংলা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে গিনিপিগ। কেউ বাংলাকে ভাগ করে পাচ্ছে দিল্লীর সিংহাসন কেউ বাংলার বৃহৎ শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পকে শ্মশানে পাঠিয়ে হচ্ছে জনদরদী সরকার। কেউ ভোট দখলের লোভে ধর্ণা অবরোধ হাঙ্গামার সিরিয়াল করে চলেছে, কিন্তু বাংলার চাষীর জন্য কারোও চিন্তা নেই। বাংলার সাড়ে ছয় কোটি চাষীর রক্ষাকর্তা আল্লা ভগবান— কোনও রাজনৈতিক দল নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের চাষীর কাছে প্রশ্ন, চাষীর স্বার্থের নামে যে সব আন্দোলন বা পরিকল্পনার গল্প বছর বছর শোনাচ্ছে তা কতটা আন্তরিক না শুধু লোক দেখানো? চাষীরা কিন্তু শেষেরটাই ভাবছে। যদিও মুখ ফুটে বলছে না। তারা মনে মনে বলছে — রাজনৈতিক দলগুলির কাছে চাষীরা তাদের আন্দোলন আন্দোলন খেলার খোরাক ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাজ্য রাজনীতি

নিরুপম মন্ত্রীত্ব ছাড়তে চান ?

নিশাকর সোম

টাটা টা-টা করে চলে গেল। কেন গেল? সে নিয়েই এখন বিতর্ক। সেই বিতর্কমূলক কথার কথা আগেই বলে নিতে চাই। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সিঙ্গুরে টাটা প্রকল্প সম্পর্কে একটি ইতিবাচক বক্তব্য রেখে সিপিএম-এর সমর্থকদের মধ্যে বিজেপি সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা সৃষ্টি করেছেন। প্রসঙ্গত নরেন্দ্র মোদী-কে সিপিএম বিগত নির্বাচনগুলিতে যতই 'দাঙ্গাবাজ' বলে এবং সৌমিত্র দস্তিদার — মহঃ সেলিমের সিডি দেখিয়ে প্রচার করুণ না কেন — একটি বাংলা সংবাদপত্রে নরেন্দ্রমোদীর বক্তব্য প্রকাশিত হওয়াতে প্রচারের সেই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত পড়েছে। সিপিএম-এর বেশ কিছু কর্মী বলতে শুরু করেছেন যে, টাটা যখন বিজেপি শাসিত গুজরাটে তাদের প্রকল্প নিয়ে গেলো — এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিজেপি প্রশাসন সম্বন্ধে টাটা তথা দেশের শিল্পপতিদের একাংশ সন্তুষ্ট এবং আগামী লোকসভার নির্বাচনের পর কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসতে চলেছে।

টাটা প্রকল্প চলে যাওয়া সম্পর্কে সিপিএম বলছে মমতা এবং রাজ্যপাল দায়ী। সিপিএম নেতা বিনয় কোঙার সমস্ত রকম শালীনতা ছাড়িয়ে জঘন্য ভাষায় রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই যে টাটারা চলে যাওয়ার পর শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেছিলেন — "আমারও আর এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না।" শোনা যায়, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন একটি পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের তীব্র সমালোচনা করে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চেয়েছিলেন — তাঁর স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, নিরুপম সেন তথা সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধমান গোষ্ঠী মমতা-রাজ্যপালের চাপে মুখ্যমন্ত্রী আত্মসমর্পণ করেছেন বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন। বুদ্ধ বাবুকে সমর্থন করে এগিয়ে এসেছেন সমঝোতাপন্থী গৌতম দেব।

ইতিমধ্যে বিতর্কিত নেতা সুভাষ চক্রবর্তী দুম করে বলে দিলেন, সিঙ্গুরে ৩১ অক্টোবরের মধ্যেই বিকল্প একটি মোটর কারখানার "মউ" স্বাক্ষর হবে।

সিপিএম-এর গুজরাট কমিটি টাটার সঙ্গে গুজরাট সরকারের চুক্তি প্রকাশ্যে আনার দাবি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই বিপদে ফেলেছে। সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেতৃত্বের এবং সরকারের (পড়ুন মুখ্যমন্ত্রীর) সমালোচনা করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী লোকসভা নির্বাচনে মিতালি খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়ে গেছে। একটি মজার সিদ্ধান্ত হয়েছে- 'সিপিআই-এর সঙ্গে ঐক্য বজায় রেখে যে রাজ্যে যেমন সুবিধা তেমন নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তুলতে হবে।' সুবিধাবাদের এক উলঙ্গ প্রকাশ।

এখন আসা যাক সিঙ্গুর কান্ডের জন্য দায়ী কে? দায়ী সিপিএম নেতৃত্ব বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী। তাঁরা আমলাদের উপর ভরসা করেছিলেন। পার্টির জেলা কমিটি, জোনাল কমিটি, লোকাল কমিটি, বামফ্রন্ট এবং তার বিধায়কদের কোনও পাত্তা না দিয়ে গরম গরম বুলি ছাড়তে লাগলেন। বুদ্ধ বাবু বললেন "আমরা ২৩৫ ওরা ৩০। ওরা যদি মারে তবে আমরা মার খেয়ে ফিরবোনা।" অথচ হুগলী জেলার পার্টির দুর্বলতা নিয়ে কিছুই খবর রাখলেন না। এর ফলে সমগ্র হুগলী জেলা পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে। হুগলী জেলা কমিটি তাদের রিপোর্টে দেখিয়েছেন যে পার্টি নেতৃত্ব স্থবির হয়ে বসে থেকে বড় বড় গরম বুলি ছুঁড়ছেন। যদিও বর্ধমান লবী হুগলী জেলা পার্টির ব্যর্থতার কথা বারবার বলেছে।

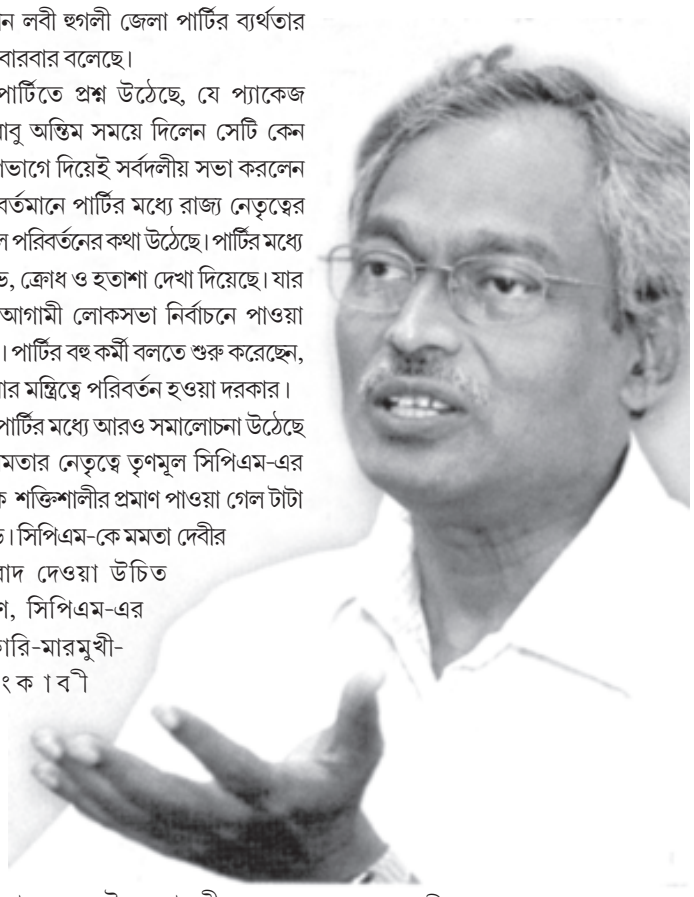

পার্টিতে প্রশ্ন উঠেছে, যে প্যাকেজ বুদ্ধ বাবু অন্তিম সময়ে দিলেন সেটি কেন আগেভাগে দিয়েই সর্বদলীয় সভা করলেন না? বর্তমানে পার্টির মধ্যে রাজ্য নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তনের কথা উঠেছে। পার্টির মধ্যে ক্ষোভ, ক্রোধ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। যার ফল আগামী লোকসভা নির্বাচনে পাওয়া যাবে। পার্টির বহু কর্মী বলতে শুরু করেছেন, একবার মন্ত্রিত্বে পরিবর্তন হওয়া দরকার।

পার্টির মধ্যে আরও সমালোচনা উঠেছে যে মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল সিপিএম-এর থেকে শক্তিশালীর প্রমাণ পাওয়া গেল টাটা কান্ডে। সিপিএম-কে মমতা দেবীর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কারণ, সিপিএম-এর হঠকারি-মারমুখী-অহংকাবী মনোভাবের জন্যই মমতাদেবী আজ রাজনৈতিক আঙিনায় বিপুল বেগে তেজ বিকিরণ করছেন। শুরুটা করেছিলেন বাদশা আলমের ভাই লালু আলম কোমরের বেল্ট খুলে মমতার মাথায় আঘাত করে তাঁকে হাফ শহীদ করে ছিলেন। মমতা সম্পর্কে সিপিএম-এর সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। সিপিএম-নেতাদের অরাজনৈতিক হঠকারী মনোভাবের আর একটি নগ্ন উদাহরণ রাজ্য পার্টির সম্পাদক বিমান বসুর উক্তি "তৃণমূল কেওড়াতলায় যাক।" ছি! ছি! — এই কী একজন রাজনৈতিক নেতার কথা! যদিও জোড়াশাঁকোর তৃণমূল বিধায়ক সম্প্রতি বিমান বসুকে সমাজসেবী বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বস্তুত নন্দীগ্রাম ঘটনায় পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক শান্ত পরিবেশ ছিল — নন্দীগ্রাম কান্ড বামফ্রন্টকে ছিন্ন ভিন্ন করলেও জনগণের মধ্যে থেকে সিপিএম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকলো। মদমত্ততার এটাই পরিণতি। এরপর ধীরে ধীরে সিপিএম হিংস্র হয়ে উঠলো। পরমত সহিষ্ণুতা সিপিএম বহুদিনই ত্যাগ করেছিল — পরে হিংস্র ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

পার্টি নেতারা নীচের তলার পার্টি কর্মীদের — পার্টি দরদীদের সঙ্গে সম্পর্ক

(এরপর ১৩ পাতায়)

অ-কে রকম

ধর্মে বাঁধা বালক পুরোহিত

গলায় রুদ্রাক্ষমালা আর ধুতি পড়া ছেলে দুটি যখন মঞ্চে উঠে গড়গড় করে ভারি ভারি ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোক আর প্রবচন শোনায় তখন চমকে যেতে হয় ৭ থেকে ৭০ সকলকেই। মুগ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে তখন সাধু সাধু ছাড়া আর কোনও আওয়াজ পাওয়া যায় না। বিস্ময় মুগ্ধ হয়ে অনেকে তো বলেই ফেলেন — এ নিশ্চয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ। অনেকে তো নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারেন না। এও কী সম্ভব? ৮ বছর বয়সী ভেঙ্কটেশ ও ৬ বছরের ইশান শর্মা কী করেই বা পারে কোনও কিছু ছাড়া গড় গড় করে ওই সব বৈদিক শ্লোক উচ্চারণ করতে, প্রবচন রাখতে। ঈশ্বরের কৃপা যে একটা আছে তা তাদের বাবাও স্বীকার করেন। বাবা মনোরঞ্জন শর্মা তো বলেই ফেললেন — 'সব হো জাতা হে, ভিঙ্কটেশ কী কই মুশকিল নেহি।' বড় দাদার কাছে থেকে থেকে ইশানেরও সব শেখা হয়ে গেছে। তারও মাথায় যেন রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ প্রভৃতি শ্লোক স্টোর হয়ে আছে। যেন প্রয়োজন শুধু একবার মাউসটা ক্লিক করার। তবে এ সাধনা আজকের নয়। কথায় আছে, প্রতিভাধররা ছোটো থেকেই প্রতিভাধর। প্রবাদটা বোধ হয় এই দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। বয়সে কম হলেও এই সাধনার শুরু আরও কম বয়স থেকে। মাত্র ৬ মাস বয়স তখন ভেঙ্কটেশ-এর। সমান করে দাঁতও বের হয়নি, কিন্তু সেই বয়স থেকেই দাঁত ভাঙ্গা শ্লোক বলে আসছে সে। এরপর যখন বয়স তিনে পা দিল তখন তো একেবারে যেন প্রৌঢ় পুরোহিত। তিন বছর বয়সেই পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রবচন দিয়েছে ভেঙ্কটেশ। দু'বছরের ছোটো ইশানও তারপর যোগ দেয় দাদার সঙ্গে। একদিন বাবাকে ছেলের ধর্ম পাগল মনের জন্যই বাসাও পাল্টাতে হয়। বাবা মা'র সঙ্গে দর্শনে আসা ভেঙ্কটেশ সেদিন বারণসীতে এসে বাবা ভোলানাথ মন্দির থেকে আর ফিরতে চাইনি। ছেলের ভক্তির কাছে নত হয়ে মনোরঞ্জনবাবুকে সপরিবারে বারাণসীতে চলে আসতে হয়। তারপর থেকেই এখানে বসবাস। এরপর চলতে থাকে পুত্রদের আধ্যাত্মিক প্রবচনের জন্য চারদিক থেকে ডাকাডাকি। এই বয়সেই ভেঙ্কটেশ ১৮ হাজার শ্লোককে ঠোঁটস্ত করে ফেলেছে। প্রবচনের জন্য বিদেশেও গেছে। নেপালের কাঠমুণ্ডুতে প্রবচন রেখেছে। এর মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলো তো আছেই। বাদ নেই আস্তিকতার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতাতেও প্রবচন দিয়েছে সে। শুধু কী প্রবচন রাখা, তা ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করতেও পটু এই দুই বালক পুরোহিত।

ইশান ও ভেঙ্কটেশ শর্মা

তিন ভাষায় পটুত্ব হয়তো ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্তু তারা তা ঘষে মেজে একেবারে খাদহীন সোনায় পরিণত করেছে। পড়াশোনাতেও কম যায় না। উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী সুভাষ পান্ডে খোদ মনোরঞ্জন বাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের পড়াশোনা চলার জন্য প্রতিমাসে ৩০০০ টাকার অনুদান ঘোষণা করে এসেছেন। শুধু কী তাই! কাশীর শঙ্করাচার্য নরেন্দ্রানন্দ সরস্বতী দুই ভাইকে শিক্ষালাভের জন্য মঠে থাকতেও বলেছিলেন। কিন্তু ইশান ও ভেঙ্কটেশ তাদের সাধনার কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ছেড়ে যেতে চায়নি।

ইশান ও ভেঙ্কটেশের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সব কাজকর্মই যেন ঈশ্বরমুখী। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত রামায়ণ মহাভারত গীতার পাঠ তো আছেই, অন্য কাজেও সেই ঈশ্বর তন্ময়তা।

অমর সিং-দের ঘৃণ্য রাজনীতি

ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে আমার স্বামীর আত্মবলিদানকে অপমান করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সারা দেশ জুড়ে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে গত কয়েকবছরে অনেক সাধারণ নিরীহ ভারতবাসীর প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। উল্লসিত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর মতো মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি আগে থেকে জানান দিয়ে সংস্থার লেটারহেডে সংবাদ মাধ্যমের দপ্তরে ই-মেল পাঠাচ্ছে — 'রোখ সকে তো রোখ লো। এইসব আন্তর্জাতিক মদতপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীরা এদেশেও তাঁদের বিরাট মাপের জনসমর্থনের ভিত্তি গড়ে তুলেছে— ঘোড়ার সামনে গাজরের মতো ঝোলানো মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের লোভ দেখিয়ে। যত মানুষ মারা যাচ্ছেন তাদের প্রায় সবাই হিন্দু। হিন্দু মন্দির, হিন্দু অধ্যুষিত বাজার এলাকা, বসত এলাকা, এমনকী হাসপাতাল। হাসপাতালেও (আমেদাবাদ ও সুরাট) এমন সব জায়গায় বোমা রাখা হয়েছিল যে, উদ্ধার করতে যাওয়া লোকেরা ওই বোমার শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভারতীয় হয়েও ওই নররাক্ষস রূপী পিশাচদের সর্বাধিক সহায়তা কারা দিচ্ছে? মুসলমান সমাজকে বাদ দিলে সেকুলার পরিচয়ধারী রাজনৈতিক নেতা এবং সপা ও বসপা দলের মুসলিম নেতারাও এই দলে সামিল। দিল্লীতে জামিয়া নগরের বাটালা হাউসের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে দিল্লী পুলিশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট মোহনচাঁদ শর্মা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে মারা যান। তাবৎ পুলিশবাহিনী যখন মোহনচাঁদ-এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকবিহ্বল তখন সমাজবাদী দলের নেতা অমর সিং ও মুলায়ম সিং যাদব-এর মতো নেতারা মুজাহিদিন ক্যাডারদের নিরীহ সাধারণ মুসলমান বলে ওই এনকাউন্টারের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে চলেছেন শুধুমাত্র মুসলিম ভোটের লোভে। সংসদেও গলা ফাটিয়েছেন। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের সন্ত্রাসবাদ রোখার ও জনসাধারণের জীবনরক্ষার স্বার্থে সপা, বসপা দল ও নেতাদের কাজকর্ম এবং সম্পত্তির বিষয়ে চুলচেরা তদন্ত করে জনসমক্ষে প্রকাশ করলে অনেক কিছুই ধরা পড়তে পারে। আবার অতিচালাকি করে অমর সিং মৃত পুলিশ অফিসার মোহনচাঁদ শর্মার স্ত্রীকে কয়েক লক্ষ টাকার চেক তুলে দিতে গিয়েছিলেন যা উনি ফেরৎ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে দিল্লী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পাঞ্চ জন্য' পত্রিকায় মোহনচাঁদ শর্মার স্ত্রীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। মোহনচাঁদ শর্মার স্ত্রী **শ্রীমতী মায়া শর্মা** *বলেন, ভোটের জন্য শহীদের অপমান যেন কেউ না করেন।*

শোকস্তব্ধ শ্রীমতী মায়া শর্মা

❑ সমাজবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক অমর সিং আপনার স্বামীর আত্মবলিদানের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

● অমর সিং-এর মনোবৃত্তি যেমন তিনি সেরকম কথাই তো বলবেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি যদি আমার স্বামীর শহীদ হওয়াকে অস্বীকার করেন তাহলে আমাকে দশ লক্ষ টাকার চেক কেন তাঁর দলের লোকেরা দিতে এসেছিল? (চেকে কথায় দশ লক্ষ লেখা থাকলেও অঙ্কে ভুল ছিল)।

❑ চেকে সই কার ছিল এবং ভুল লেখার মানে কী?

● চেকে সমাজবাদী দলের সভাপতি মুলায়ম সিং যাদবের হস্তাক্ষর ছিল। কথায় দশ লক্ষ লেখা থাকলেও অঙ্কে একটা শূন্য কম ছিল, অর্থাৎ এক লক্ষ। যারা আমাকে চেক দিতে এসেছিলেন তাদেরকে বলাতে তারা আমাকেই শূন্য বসাতে বলেন। আমি বললাম, এটা আমি করতে পারব না। আপনারা চেক ফেরৎ নিয়ে যান। ওরা চেক রেখে যান। আমি পরে ফেরৎ দিয়ে দিই।

❑ অমর সিং বলেছেন, দ্বিতীয়বার চেক দেওয়া হবে?

● এত কথা বলার পরেও যদি চেক দিতে আসেন, আমি তা নিতে পারব না। তাছাড়া তাদেরকে এলাকার মানুষের ক্ষোভের সম্মুখীন হতে হবে। সবার মনে ক্ষোভ জমা রয়েছে।

❑ আপনার স্বামীর চিতার উপরে অনেকে রাজনীতি করছেন। কিছু বলবেন ....

● এরকম নেতাদের কারও দুঃখ কষ্টের প্রতি সহানুভূতিই নেই। এদের তো আমাদের বাড়ির বাইরে যে রিক্সাচালকরা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। আমাকে অনেকে বলেছেন, রিক্সাচালকরা যখন শুনেছেন যে শহীদের বাড়িতে যাচ্ছেন দেখা করতে তখন তাদের কাছ থেকে ওরা রিক্সা ভাড়াও নেননি। এখন আপনারাই বলুন, রিক্সাওয়ালারা বেশি দেশভক্ত না ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে অভ্যস্থ নেতারা?

❑ এখন তো বাটালা হাউসের এনকাউন্টারের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি (অমর সিং, মুলায়ম, মায়াবতী, সলমন খুরসিদরা) করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ইন্সপেক্টর শর্মা কেন বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরেননি?

● কিছু লোক শুধু ভোট ব্যাঙ্কের দলীয় রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থে আমার স্বামীর আত্মবলিদানকে অপমান করছেন। বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের ওজনই ৩৫ কেজি। তা পরলে পুলিশওয়ালা বলে ধরা পড়ে যাওয়া নিশ্চিত। এজন্যই উনি জ্যাকেট পরেননি। বিচার বিভাগীয় তদন্তে আমার কোনও আপত্তি নেই। তদন্ত হোক বা না হোক আমার স্বামী তো আর ফিরে আসবেন না। আমার সিঁথির সিন্দুর মুছে গেছে, দুটো ছেলের মাথার উপর থেকে বাবার আশ্রয় মুছে গেছে।

শহীদ মোহনচাঁদ শর্মা

শু অনেক রাজ্য সরকার আপনাকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখনও অবধি কোন্ কোন্ সরকার সাহায্য দিয়েছে?

● উত্তরাখণ্ড এবং দিল্লী সরকার দিয়েছে। আমার ইচ্ছা তার বদলে আমার স্বামীর স্মৃতিতে হাসপাতাল অথবা শিক্ষালয় নির্মাণ হোক। সারা দেশেরই লাভ হবে।

সিপিএম 'ইউ সি' জমা না দেওয়ায়

পঞ্চায়েত প্রকল্পের কাজ বন্ধ উঃ দিনাজপুরে

মহাবীর প্রসাদ টোডী ।। উত্তর দিনাজপুরে সি পি এম পরিচালিত বিগত জেলা পরিষদ বোর্ড ১০০ দিনের কাজের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট (ইউ সি) জমা না দেওয়ার ফলে জেলায় প্রকল্পের টাকা আসছে না। ফলে জেলার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, এই অনিয়মের জেরে জেলায় টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছে। কাজ বন্ধ থাকায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ কাজের খোঁজে ভিন্ রাজ্যে (দিল্লী পাঞ্জাব হরিয়ানা) চলে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ণ) পীযূষ কান্তি দত্ত এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত গত আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে খরচ হওয়া টাকার ইউ সি জমা দিতে না পারায় কেন্দ্র থেকে টাকা আসছে না বা আসা বন্ধ হয়েছে।

এবার সি পি এমকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসা কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে, সি পি এমের দখলে থাকা বহু পঞ্চায়েত ইউ সি জমা না দেওয়ায় এখন অনেক চেষ্টা করেও সিপিএমের আমলে কীভাবে টাকা খরচ করা হয়েছে তার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ইউ সি তৈরি করতে প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য যে, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা খরচ নিয়ে জেলার সি পি এমের অধীন পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে ভোটের আগে বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। এ জেলার চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রশাসন এফ আই আর করেছিল। প্রকাশ যে, ওই সিপিএম প্রধান রাজ্যের এক রাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আত্মীয়।

এদিকে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গত আর্থিক বছরে জেলার ১০০ দিনের কাজ ১০ থেকে ১২ দিন হয়েছে। জবকার্ড বিলি নিয়ে প্রায় সমস্ত ব্লকেই ব্যাপক অনিয়ম ও গন্ডগোল হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজ না করেই টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এ জেলাতে সিপিএম পরিচালিত জেলা পরিষদ বোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে পুকুর চুরি করার জন্য এবার পঞ্চায়েতের ভোটে সিপিএম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বললে হয়তো কোনও অত্যুক্তি হবে না।

বাংলাদেশে পাচারের ফলে চালের দাম বাড়ছে ত্রিপুরায়

সংবাদদাতা ।। ত্রিপুরায় চালের দাম ক্রমবর্ধমান আর তাও অমিল, তাই ভিন্‌রাজ্যের যোগানের উপর ভরসা করতে হচ্ছে। কিন্তু এই অভাব যে তৈরি করা সম্প্রতি তা জানা গিয়েছে। ত্রিপুরার বাংলাদেশ লাগোয়া সোনামুড়া দিয়ে ব্যাপক পরিমাণে চাল ট্রাকভর্ত্তি হয়ে বাংলাদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য পুলিশও তাদের আটকাতে পারছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ অফিসারের মতে, একশ্রেণীর অসাধু সীমান্ত প্রহরী এবং ব্যবসায়ী তথা চোরাচালানকারীদের যোগসাজশে একাজ হচ্ছে। বাংলাদেশেও চালের প্রচণ্ড অভাব। গতবছর প্রচণ্ড ঝড়ে ফসল নষ্ট হওয়ার ক্ষতি এখনও বাংলাদেশ পুষিয়ে উঠতে পারেনি। যদিও পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকার টন টন চাল বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। তবে তাও বাংলাদেশের জনসমুদ্রের পক্ষে সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। ভারতে চালের বাজার তেমন সুবিধের নয়। এখানেও একটু ভালো চালের দাম কুড়ি টাকা কেজি বা তার বেশি। যে সময় নতুন ধান ওঠে তখন চালের দাম কমার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না।

ত্রিপুরা পুলিশের ওই অফিসারের বক্তব্য হল, প্রায় একবছর ধরে বাংলাদেশে চাল পাচার হয়ে আসছে। গত ছ'মাসে এর পরিমাণটা অনেক বেড়েছে। তাঁর কথায় প্রতিদিন গড়ে কুড়িটি বড় ট্রাক কম করে চারশ মেট্রিক টন অর্থাৎ চার লক্ষ কেজি চাল পাচার করছে। ট্রাকগুলো আবার একসঙ্গে আসে না। ট্রাফিক আইন ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পক্ষেই এই চালপাচার বন্ধ করা সম্ভব। অফিসাররা বৈঠকে ট্রাক আটকের বিষয়ে সহমত হলেও সীমান্তের জিরো পয়েন্টে টহলরত কিছু জওয়ান লোভের বশবর্তী হয়ে অবাধে চাল পাচারের সুযোগ দিয়ে আসছে। দুপারেই চালের দাম খুব বেশি — সেজন্য একটি চক্র চালপাচারে মরিয়া। ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের চার হাজার কিমি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অবৈধভাবে চাল ঢুকছে। পশ্চিমী দেশ থেকে যে খাদ্যশস্য অনুদান হিসেবে পাওয়া যেত সেখানেও টান পড়েছে। কেননা উদ্ভিজ জ্বালানি তৈরি করতে গিয়ে আমেরিকাসহ পশ্চিমী দেশগুলোতেও খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে। তেল মজুতের পর এবার তারা খাদ্যশস্য মজুত করতে শুরু করেছে। আবার বাংলাদেশের একটি চক্রও সেদেশ থেকে গোপনে বিদেশে চাল পাচার করছে। ভারতের বিশাল বিশাল গুদামে চালের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সে জন্য কড়া মূল্য দিতে হবে ত্রিপুরা সহ সমস্ত ভারতবাসীকে।

মেঘালয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কে এস ইউ'র দাবি

সংবাদদাতা ।। মেঘালয়ের খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (কে এস ইউ)অনুপ্রবেশ রোধে মেঘালয় মন্ত্রিসভার গৃহীত সুপারিশগুলি অতিসত্বর পেশ করার দাবি জানিয়েছে। রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে দেশীয় নাগরিকরাই হুমকির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ডঃ দোনকুপার রয়-এর নেতৃত্বাধীন এম পি এ সরকারের নিকট অতিসত্বর মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণের আহ্বান জানিয়েছে। কে এস ইউ'র সাধারণ সম্পাদক হেমলেট দোলিং বলেছেন, যেভাবে অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যে প্রবেশ করছে তা খুবই উদ্বেগের বিষয়। রাজ্য সরকারও মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যার ফলে রাজ্যের অনুপ্রবেশ পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। তিনি এম পি এ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, এই সমস্যা সমাধানে সরকারকে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী রূপায়ণে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বেশীর ভাগই বাংলাদেশী নাগরিক। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, তাতেবাংলাদেশীরা জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজে যুক্ত। তাই রাজ্য সরকারকে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে আরও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অনুপ্রবেশকারীদের তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর দা বি জানিয়েছে কে এস ইউ'র সাধারণ সম্পাদক।

উদ্বাস্তুদের মিজোরাম ছাড়তে নির্দেশ

সংবাদদাতা ।। মিজোরামে বসবাসরত মায়ানমারের উদ্বাস্তুদের রাজ্য ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ইয়ং মিজো এসোসিয়েশন। মিজোরামের তানরিশ এলাকায় বসবাসরত মায়ানমারের উদ্বাস্তুদের আগামী ৪ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত গ্রামের যুব সংগঠনের নেতা লালরিন সাঙ্গা বলেন, উদ্বাস্তুদের আচরণে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। এই গ্রামে ত্রিশজনের মতো উদ্বাস্তুর বসবাস। তবে এসোসিয়েশনের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে কোনও কিছু জানানো হয়নি।

বাংলা সংবাদসাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

একটি সমীক্ষা

উন্নয়নের নিরীখে কোন রাজ্য কোথায় দাঁড়িয়ে

রাজনীতির জন্য রাজনীতি ? না উন্নতির জন্য রাজনীতি ? স্বাধীনতার ৬১ বছর পর এই প্রশ্ন নিয়েই একটা সমীক্ষা। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাজ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা, চিকিৎসা, স্বচ্ছতা (স্যানিটেশন), রোজগার প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে যে সমানুপাতিক উন্নতি করেছে তার এক সামগ্রিক পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হল। কয়েকটি বিষয়কে সর্বমোট ১০০ শতাংশ ধরে বিভিন্ন খাতে উন্নতিকে সেই শতাংশের অনুপাতে ভাগ করা হয়েছে।

বড় রাজ্য

	স্বাস্থ্য পরিষেবা	শিক্ষা	চাকুরী	দারিদ্র্য দূরীকরণ	মহিলা সশক্তিকরণ	জল ও স্বচ্ছতা	নাগরিক নিরাপত্তা	সাধারণ পরিকাঠামো	পরিবেশ সুরক্ষা	সবকিছুর মোট
সবকিছুর অনুপাতে	১২.৫%	১২.৫%	১০%	১২.৫%	১০%	১২.৫%	১০%	১০%	১০%	১০০%
১ কেরালা	৯৮.২২	১০০	৪৭.৫১	৪৩.৯১	৯৯.০১	৬১.৫৪	৫.৪৫	৭৬.৬২	৭৫.০৭	৬৮.৩৩
২ হিমাচল প্রদেশ	৫৬.১৮	৮৯.৬২	৭১.২৬	৫৩.৭২	৮৫.৫৭	৬৬.২৪	৬.৫১	৭৪.৯০	৭৭.৯৭	৬৪.৮৪
৩ পাঞ্জাব	৬৩.৯১	৮৩.০৫	৫৫.০২	৬৭.৮৬	৭৮.২৭	৮৫.২০	৪.৪০	৬৩.৬৭	৩০.৯৮	৬০.৭৪
৪ তামিলনাড়ু	৬৮.৮৫	৭৮.৫৬	৭৭.০০	৩১.০৪	৮৩.৬৩	৬৩.৭৪	১০.৩২	৬৫.৩০	৪৭.৬৫	৫৮.৬৬
৫ গুজরাট	৫৭.০৯	৮২.০৫	৯৩.৩২	৩৪.৬৩	৭৩.০১	৬৯.৬৬	৫.২৫	৬০.৭৪	৩৪.৬৩	৫৭.১৩
৬ কর্ণাটক	৫৯.৯৩	৮০.৮৬	৮৫.৯৫	২৯.২৮	৭৫.৩৮	৬৫.৯৯	৬.৮৩	৬০.৩৫	৪২.৫৯	৫৬.৬২
৭ মহারাষ্ট্র	৬৫.১৭	৮৮.৩৫	৭৪.৩৭	২৭.৫৬	৮০.২৪	৬৭.৩৪	৪.৫৯	৫৮.৮৬	৩৪.৩৯	৫৬.৩০
৮ অন্ধ্রপ্রদেশ	৫৮.৭৮	৭৮.৫৬	৮০.০৩	৩৬.৭৮	৭৪.৭৫	৫৮.৭৭	৬.২৭	৫৬.৬৭	৪০.৪৩	৫৪.৯৩
৯ হরিয়ানা	৫৫.৭৬	৭৭.৬৮	৫৬.৬৪	৪৫.২৪	৬৭.৯৪	৬৯.২৬	৪.০১	৫৫.৮৮	৪৪.০৭	৫৩.৮৫
১০ অসম	৪৬.০৭	৭২.৪৯	৫৩.৬৬	২৬.২৭	৭৩.২৫	৬৭.৮৯	৭.০৫	৪১.৯৮	৬৪.৯৪	৫০.৬৮
১১ পশ্চিমবঙ্গ	৫৮.৭৯	৭৬.৪৬	৫৫.১৯	২৬.৯৮	৭৬.০৮	৭৪.৯১	৪.৭৫	৩৯.৬১	২৮.৯৬	৫০.১০
১২ মধ্যপ্রদেশ	৪৫.৬৯	৭৫.৪৯	৮৭.৪৪	২১.১০	৬২.৯১	৪৭.২৮	৪.৫৬	৫৩.০১	৪৩.৪৫	৪৮.৮৩
১৩ রাজস্থান	৪৯.৯১	৬৯.১৩	৭৬.২৭	৩২.৯৯	৫৯.০৫	৫০.৩২	৫.৭২	৫৩.১৯	৩৬.৫৯	৪৮.৩৮
১৪ ওড়িশা	৪৮.০৮	৬৮.৫১	৪৯.৯৫	২২.০৫	৬৮.৪৬	৩৯.৪৫	৩.৯৪	৬০.৭৬	৭৬.৭৬	৪৮.০৮
১৫ জম্মু-কাশ্মীর	০.০০	৭৮.৬৭	৫৮.৬৩	৮৪.১৩	৬৪.৬১	৬৫.৪২	৫.৬৪	৫৭.৬৫	০.০০	৪৭.১৮
১৬ উত্তরপ্রদেশ	৪৭.৭৩	৬৫.৭০	৭৪.৩২	২৪.৩৫	৫৬.৫২	৫৮.৯৭	১৬.৯৬	৪০.৭৮	২৯.৩১	৪৬.২৬
১৭ উত্তরাখণ্ড	০.০০	৮১.৩৭	০.০০	০.০০	৭৪.৪৯	৭৫.৪৬	৯৬.৭৩	৫৭.০৯	২৮.৯১	৪৫.৩৩
১৮ বিহার	৪৯.৬৩	৫৭.৩১	৪৯.২৯	১৯.২৮	৫২.০২	৫৩.৫০	৫.২৪	২৮.৮৭	২৮.৫৭	৩৮.৮৬
১৯ ছত্তিশগড়	০.০০	৭৩.৪৭	৭৮.৬২	০.০০	৭০.৫৩	০.০০	৪.৯১	৪৩.০৬	৩৪.২৭	৩২.৩২
২০ ঝাড়খণ্ড	০.০০	৬২.৭৭	৫৩.৭৩	০.০০	৫৮.৬৮	৩৪.২৫	৫.৩৮	২২.৩৮	২১.২৩	২৮.২৭

ছোট রাজ্য

	স্বাস্থ্য পরিষেবা	শিক্ষা	চাকুরী	দারিদ্র্য দূরীকরণ	মহিলা সশক্তি(করণ	জল ও স্বচ্ছতা	নাগরিক নিরাপত্তা	সাধারণ পরিকাঠামো	পরিবেশ সুর(া	সর্ব মোট
সবকিছুর অনুপাতে	—	১৬.৫%	—	১৬.৫%	১৩%	১৬.৫%	১২.৫%	১২.৫%	১২.৫%	১০০%
১ গোয়া	—	৯১.৯০	—	৫৫.১৫	৯২.৪৩	৬৮.৪১	২৬.৪৫	৭২.২৮	৯১.৯৩	৭৮.০০
২ সিকিম	—	৮৬.৩৩	—	৩৬.৭৪	৭৯.১২	৮০.১৭	৭৭.০৫	৫৫.৯৪	০.০০	৬০.৪৪
৩ মেঘালয়	—	৮০.৫১	—	২৬.২৬	৭১.৭৩	৫৩.৭০	৩৩.২৫	৪২.১৯	৯৪.৪৭	৫৭.০৪
৪ মিজোরাম	—	৯২.২৭	—	৪৬.২৫	৮৮.৯৭	৬৬.০০	২০.৯৩	৫১.৩৩	০.০০	৫৪.৩৫
৫ নাগাল্যাণ্ড	—	৮৫.২৫	—	২৮.৭৮	৭১.৮৬	৬৭.১০	৬২.৭৬	৫৭.৪৭	০.০০	৫৪.২৬
৬ মণিপুর	—	৮৪.২৭	—	৩৭.৮৪	৭৪.৯২	৬৭.৬৪	৫৩.৫৩	৪৪.০৬	০.০০	৫৩.২৫
৭ দিল্লী	—	—	—	৫৮.৪২	৮৪.০৭	৯৭.৪৩	১৬.৩৮	৬৯.০৯	২৪.৬৪	৫০.৪১
৮ অরুণাচল প্রদেশ	—	৭১.৫১	—	৩১.১৪	৬৩.৬৯	৭৩.৯০	০.০০	৬৮.০৭	০.০০	৪৫.৯২
৯ ত্রিপুরা	—	—	—	২৭.৫২	৮২.৩৮	৭৪.৪৩	২৪.২২	৩৮.৫৯	০.০০	৩৫.৩৮
১০ পণ্ডিচেরী	—	৮০.৩৯	—	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৬.৬২	২১.৫৯

[আউটলুক পত্রিকার (৬.১০.০৮) সৌজন্যে প্রাপ্ত]

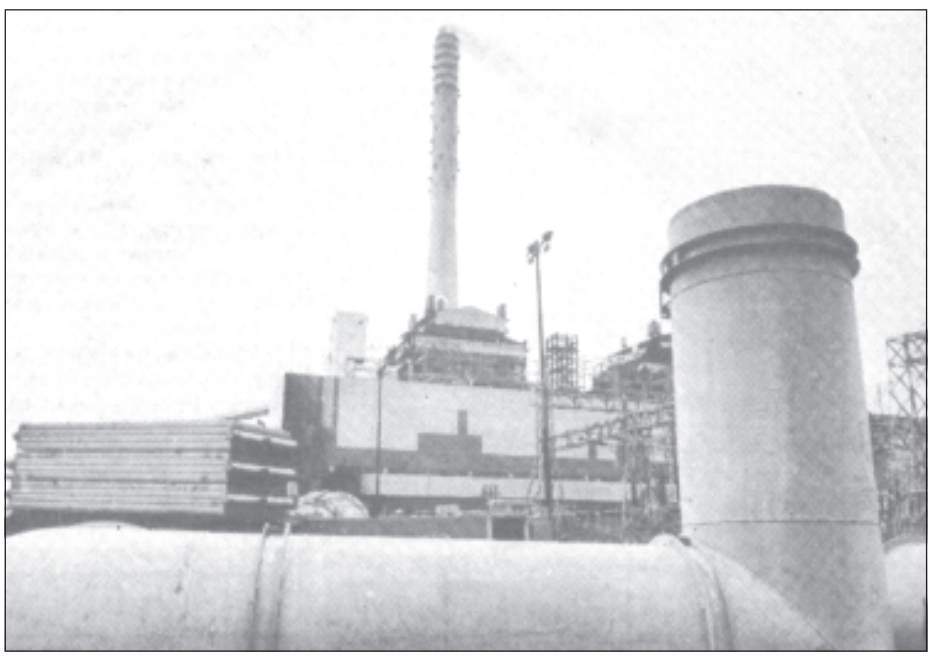

বজবজে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

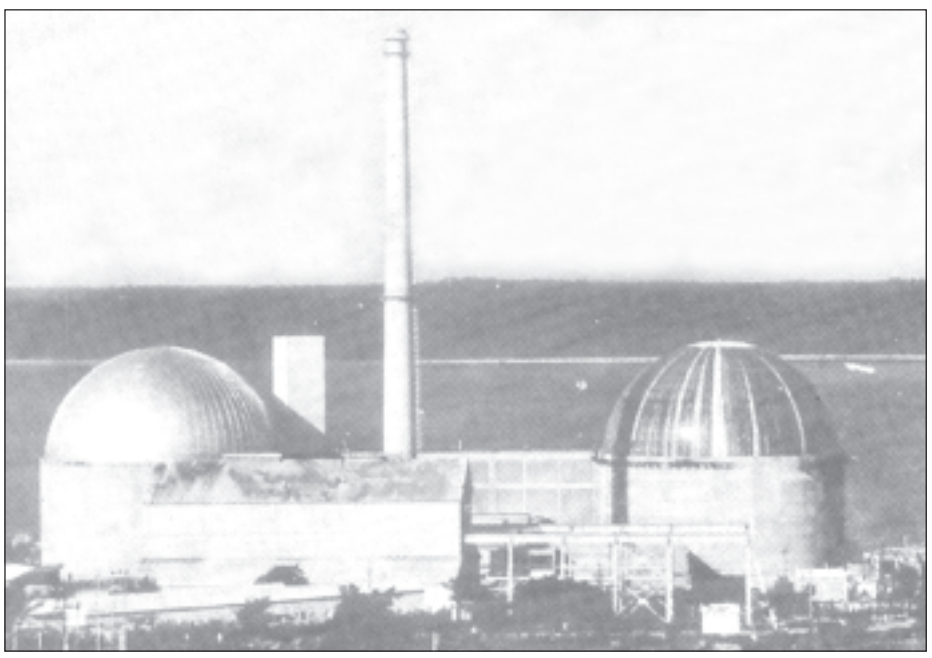

রাজস্থানে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক্রমহ্রাসমান কয়লার ভাণ্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি কতটা জরুরি ?

এন সি দে

কথিত আছে এদেশের মানুষ সরল ও সাধাসিধা এবং সহজেই বিশ্বাস করে ঠকা তার মজ্জাগত। তার মধ্যে বাঙালীরা আবার হুজুগে। যেহেতু বেশীর ভাগ বাঙালী পড়তে জানে তাই বিদেশীরা এদেশে তাদের পোষ্য সাংবাদিক ও লেখক নামক কিছু তথাকথিত বুদ্ধি জীবীদের মাধ্যমে সংবাদপত্রে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় লিখিয়ে এই লেখাপড়া জানা বাঙালীদের মধ্যে হুজুগ সৃষ্টি করে। আপন জাতির স্বার্থ ভুলে হুজুগে মেতে থাকার কোনদিন ভাল করতে পারে না।

বর্তমানে এদেশের কিছু মানুষকে মাতিয়ে তোলা হয়েছে এই বলে যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। বিদ্যুৎ সমস্যা মিটে যাবে, সন্ধ্যা হলেই আর নেমে আসবে না লোডশেডিংয়ের অন্ধকার। কী অপরূপ ভোজবাজির বন্দোবস্ত করেছে মনমোহনজী। তাঁর মনমোহিনীর তুলনা নেই! আমেরিকার সঙ্গে তাঁর পারমাণবিক চুক্তিকে আড়াল করতে তিনি শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করছেন কয়লাকে। এদেশে আমেরিকা ও কংগ্রেস তথা সনিয়ার দালালরা রটাচ্ছেন কয়লার ভান্ডার নাকি ক্রমহ্রাসমান! তাই এখনই পারমাণবিক শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হোক।

এটা ঠিক যে কয়লার ভান্ডার ক্রমহ্রাসমান। কারণ কয়লা প্রকৃতি সৃষ্ট খনিজ সম্পদ। মানুষ কয়লা উৎপাদন করতে পারে না; শুধু প্রকৃতির গর্ভ ভেদ করে তা তুলতে পারে। তাই কয়লাকে খনি বিশেষজ্ঞগণ Non-Renewable of Energy বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ শক্তির এই উৎস পুনর্নবীকরণ বা জন্দ্ধন্দ্বভ্র করা যায় না। কিন্তু মজার কথা হল সব প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদই তো non renewable অর্থাৎ এইগুলির ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা যায় না, যা প্রকৃতি দিয়েছে তাই শুধু দোহন করা যায়। পারমাণবিক শক্তির উৎস হল ইউরেনিয়াম যা প্রকৃতিই সৃষ্টি করেছে। শক্তির এই প্রাকৃতিক উৎসটিও সীমিত ও non-renewable, প্রকৃতির গর্ভ ভেদ করে এই ইউরেনিয়াম তুলে ক্রমাগত ব্যবহার করলে এর ভান্ডারও তো ফুরিয়ে যাবে। সেদিক থেকে দেখলে ‘কয়লা ও ইউরেনিয়াম’ — দুটি প্রাকৃতিক সম্পদই ক্রমহ্রাসমান। ব্যবহার করলে দুটিরই ভাণ্ডার একদিন নিঃশেষিত হবে। এখন দেখা যাক কোন ভান্ডারটি মজবুত।

একথা অনস্বীকার্য যে শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে কয়লা ভারতের একটি মূল্যবান সম্পদ। এদেশে সমস্ত শিল্পের অগ্রদূত এই কয়লা শিল্প। কারণ কয়লা শিল্পের জয়যাত্রার অনেক অনেক পরেই শুরু হয় অন্যান্য সমস্ত শিল্পের যাত্রা। ভারতের প্রথম শক্তিচালিত ফ্যাক্টরী ‘মেসার্স অকল্যান্ড অ্যান্ড সেন কোম্পানী’টি চালু হয়েছিল কয়লা শিল্পের ১১০ বছর পরে। কিন্তু সমস্ত শিল্পের ধারক ও বাহক হলেও, কয়লা শিল্পকে কখনই দেশের অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। কথায় বলে কয়লার ময়লা শত ধুলেও যায় না। কয়লা শিল্পের গায়েও শুরু থেকেই যে ময়লা লেগেছিল আজও তা অটুটই রয়ে গেছে। এ যেন পরের জন্য জ্বলে জ্বলে ছাই হওয়ার জন্যই জন্মানো। ভারতমাতা তার গর্ভে কোটি কোটি টন কয়লা ধারণ করে রয়েছে শত শত বছর ধরে। কয়েক বছর আগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তাদের সার্ভে রিপোর্টে জানিয়েছিল যে ১২০০ মিটার গভীর স্তর পর্যন্ত মজুত কয়লার পরিমাণ হল ২১২ বিলিয়ন টন যার মধ্যে ২৫ শতাংশই হল কোকিং কোল। বর্তমান হারে কয়লা ব্যবহার করলে এই কয়লার বিপুল ভান্ডার নিঃশেষ হতে সময় লাগবে ২৫০ বছর। কয়লার নতুন স্তর ও ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলে তো কথাই নেই। একথা ভুললে চলবে না যে কয়লা শিল্পের জয়যাত্রার প্রায় স্বর্ণযুগ থেকেই এমনকী পরাধীন ভারতের বৃটিশ সরকারও কয়লা ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাই নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই প্রথমে Coal Commissioner এবং পরে Coal Controller-ও তার বিশাল অফিস গড়ে তুলেছিল। এই Coal Controller বা কয়লা নিয়ন্ত্রক এবং তার অফিস আজও আছে। কিন্তু কয়লা নিয়ন্ত্রক আজ কয়লার মতোই অবহেলিত, ঠুঁটো জগন্নাথ। তবে এটাও ঠিক কথা যে কয়লার ব্যবহার যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কয়লা উত্তোলনেও নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। তাছাড়া শক্তির অন্যান্য উৎসের দুয়ার খুলে যাওয়ায় কয়লা ব্যবহারও অনেকাংশে কমে গেছে।

রেল পরিবহনে কয়লার জায়গায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুৎ। ঘরে ঘরে কয়লার উনুনের পরিবর্তে আজ জ্বলছে গ্যাসের উনুন। অতএব কয়লাকে এখনই গলা ধাক্কা দেওয়ার চিন্তা অমূলক।

উল্টোদিকে আমাদের দেশের মাটির তলায় রয়েছে প্রায় ৭০,০০০ টন ইউরেনিয়াম। যা থেকে মাত্র ১০,০০০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। দেশে বর্তমানে ১,৪৪,৫৬৪.৯৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো আছে। এর মধ্যে ৬৪.৬ শতাংশ আসে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে; ১০.৫ শতাংশ আসে জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আর মাত্র ২.৯ শতাংশ হল পরমাণু বিদ্যুৎ। বর্তমানে দেশে ১৭টি পরমাণু চুল্লী থেকে আসে মাত্র গড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার পরমাণু মেগাওয়াট (Mwe)। বর্তমান হুত্নট্ট সরকার ২৫ বছরের জন্য ২০,০০০ মেগাওয়াটের এক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। ২০ বছরে ১৫টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে তোলারও পরিকল্পনা করেছেন। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি ডলার।

কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে? কোথা থেকে আবার, সেই সব দেশগুলো থেকে যারা আমাদের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কারণ তাদের পরমাণু কেন্দ্রগুলি গত ৩০ বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে ভারতের মতো বৃহৎ বাজারের অপেক্ষায়। এইসব দেশের বৃহৎ কোম্পানীগুলি যেমন GE, Westing house, Areva এবং Atomstroy Exports ভারতের কেন্দ্রগুলিতে যৌথ মলিকানা করায়ত্ত করবার জন্য প্রত্যক্ষ বিদেশী মূলধন বিনিয়োগে (FDI) এক পা এগিয়েই আছে অথবা বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এবং পরমাণু প্রযুক্তি উৎপাদক কোম্পানীগুলি ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়েই রয়েছে এই চুক্তিতে যে উৎপাদিত সামগ্রী তাদেরই বিক্রি করতে হবে। ঠিক যেমন আমাদের দেশে মহাজনরা কৃষকদের দাদন দিয়ে ফসল করায়ত্ত করে থাকে। আর ফসল ওঠার সময় কৃষকরা কোনও দিশা না পেয়ে আত্মহত্যা করে থাকে। আমাদের দেশের সরকারের সেই অবস্থা হতে বাধ্য।

ভারতের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি করাটা আমেরিকার পক্ষে যে কতটা জরুরি তা পরিষ্কার হয়ে গেছে মার্কিন বণিক সভার ভাইস চেয়ারম্যান ব্রুস জোসটেনের এক চিঠিতে। তিনি মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন— “আমরা ভারত-মার্কিন ১২৩ চুক্তির পক্ষে। মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ করছি, তারা যেন চলতি অধিবেশনেই এই চুক্তি অনুমোদন করে দেয়। কারণ “এই চুক্তি মার্কিন তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটাবে। চাকরি পেতে পারেন আড়াই লক্ষ মার্কিন। তাছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের যে পরিমাণ পরমাণু জ্বালানির চাহিদা তৈরি হবে, তাতে ১৫ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন মার্কিন লগ্নিকারীরা।” আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স’-র মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি এখন এদেশ থেকে সর্বপ্রকার পরমাণু প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির অর্ডারের অপেক্ষায় আছে। এর পরিমাণও হবে কোটি কোটি ডলার। ট্রত্রব্রখট্রণ্ড্রট্রত্ত-র চেয়ারম্যান বেনুগোপাল এন ধূতের মতে, আগামী ১৫ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়াবে দুই লক্ষ কোটি টাকায়।

একদিকে পরমাণু প্রযুক্তি বানিয়ে পরমাণু শক্তি উৎপাদন বহু ব্যয়সাধ্য। অন্যদিকে মানব সমাজ ও প্রাণী জগত ধ্বংসকারী এই পরমাণু শক্তি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পড়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে আমরা থোরিয়াম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি। কারণ সারা পৃথিবীর গচ্ছিত থোরিয়ামের ৩৪ শতাংশই ভারতের দক্ষিণী উপকূলের বালুরাশিতে পাওয়া যায়। ডঃ ভাবা কিন্তু এই স্বপ্নই দেখেছিলেন।

যাই হোক, যেহেতু পরমাণু চুক্তির সমালোচনা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়, সেহেতু এই চুক্তির ভাল-মন্দ নিয়ে আলোচনা করাটা অপ্রাসঙ্গিক। এই লেখার উদ্দেশ্য কেবল দেখানো যে কয়লার ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে — সেই যুক্তিতে পরমাণু শক্তি

(এরপর ৯ পাতায়)

সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি

ধনতন্ত্রের ওপর এক বড় প্রশ্নচিহ্ন

অর্ণব নাগ ।। এক নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি। কিছুদিন আগে মার্কিন অর্থনৈতিক সংস্থা লেম্যান ব্রাদার্স নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই এই সংকটের সূচনা। সংকট ক্রমবর্ধিত হয় ফ্যানি মে ও ফ্রেডি ম্যাক-এর মতো দুটি বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্কও একই সময় নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করায়। অকস্মাৎ এই ধাক্কায় আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে ভুগতে শুরু করে দেন শেয়ার মার্কেট ও মিউচুয়াল ফান্ডের লগ্নীকারীরা। লগ্নী তুলতে থাকায় এক ধাক্কায় নেমে যায় শেয়ার মার্কেটের সূচক।

শুধুমাত্র আমেরিকাতেই নয়, এই আঘাতের আঁচ পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেও। হংকং-এর হ্যাঙ-সেঙ, জাপানের নিক্কেই, সাংহাই-এর শেয়ার সূচক, লন্ডনের এফ টি এস ই-এর সঙ্গে সঙ্গে সেই ধাক্কায় নেমে যায় ভারতীয় শেয়ার বাজারের সেনসেক্সও। এই প্রতিবেদন লেখার সময় সেনসেক্স ৯৯৭৫ পয়েন্টে গিয়ে ঠেকেছে। ২০০৬-এর জুলাই-এর পর এই প্রথমবারের জন্য সেনসেক্স ১০,০০০ পয়েন্টের নীচে এসে পৌঁছল। বিশ্বজুড়ে এই অর্থনৈতিক উথাল-পাতাল শুরু হয়েছিল তখনই, যখন ব্যারল প্রতি তেলের দাম ক্রমাগত হারে বেড়েই চলছিল। যার দরুন বিমান সংস্থাগুলি যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল। আর বর্তমানে বিশ্বজুড়ে চলা আর্থিক মন্দার দরুন বিমানে যাত্রী সংখ্যাও ক্রমহ্রাসমান। তাই ক্ষতি সামলাতে গাটছড়া বাধতে বাধ্য হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই বিমান সংস্থা বিজয় গোয়েলের জেট এয়ারওয়েজ ও বিজয় মালিয়ার কিংফিশার। জোট বাঁধার সাথে সাথেই বিপর্যস্ত অর্থনীতির হাত ধরে ৮৫০ জন কেবিন ক্রু সমেত ১৯০০ জন উড়ান কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেয় জেট। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে চাপের মুখে ছাঁটাই কর্মীদের কাজে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয় এয়ারওয়েজ কর্তৃপক্ষ। প্রায় ১৫০০ কর্মীকে বিনা বেতনে ৫ বছরের ছুটিতে পাঠানোর কথা ভাবছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষও। এককথায় আমেরিকার অর্থনৈতিক সঙ্কটের আঁচ লেগেছে ভারতীয় অর্থনীতিতেও। যার ফলে ইনফোসিস, উইপ্রো, টি সি এসের মতো আই টি কোম্পানীগুলি বেশ ক্ষতির সামনে পড়ছে। যার জন্য অসংখ্য আই টি কর্মী চাকরি হারানোর আশঙ্কায় প্রহর গুণছেন। ডলারের তুলনায় কমে যায় টাকার দামও।

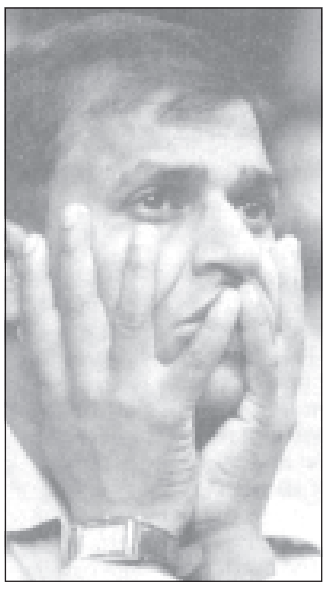

বিশ্বের এই নয়া সমস্যাটি উদ্ভূত হয়েছে গৃহঋণকে কেন্দ্র করে। লেম্যান ব্রাদার্স, ফ্যানি মে বা ফ্রেডি ম্যাকের মতো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কগুলি যে অর্থনৈতিক পথকে অবলম্বন করায় দেউলিয়া হয়েছে, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তাকে ভ্রান্ত অর্থনীতি বলে মনে করছেন। তাঁদের মতে সনাতন ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এই ব্যাঙ্কগুলি। কিন্তু এজন্য প্রয়োজনীয় জরুরী নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

সনাতনী একমাত্রিক ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে একদল লোক ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতেন ও তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে সুদ পেতেন। অপরদিকে আরেক দলের লোক ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করতেন এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে ধার শোধ করতেন। বলা বাহুল্য, যে দলের ব্যক্তিরা ধার শোধ করতেন তাদের সুদের হার যে দলের ব্যক্তিরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন তাদের সুদের হারের থেকে বেশী হতো। এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কও তাদের নিজেদের ভাল লাভ রাখতে পারত। কিন্তু পশ্চিমী দুনিয়া যে নতুন ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি চালু করেছে তাতে শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের লগ্নিকারী, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকছে না, নতুন ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে একই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ঋণ ও সুদ আদায়কারী সংস্থা, বিমা কোম্পানী ও মিউচুয়াল ফান্ড সমেত বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট সংস্থা। সব মিলিয়ে এই জটিল বহুমাত্রিক ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে সামগ্রিক লাভের পরিমাণ হয়ত আগেকার তুলনায় বেশি হচ্ছে কিন্তু এতে যে চূড়ান্ত ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে— এই সঙ্কটের আগে কেউই তা অনুভব করতে পারেননি কেন, তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার এ বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে চমৎকারভাবে জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখনীতে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে টাকা বিনিয়োগ হবার পর জিপি মরগ্যান বা অ্যামেরিকোয়েস্টের মতো কোনও সংস্থাকে কিছু কমিশনের বিনিময়ে ঋণ ও সুদ আদায়ের জন্য নিয়োগ করছে। দ্বিতীয়ত, এ আই জি-র মতো কোনও অতিকায় বিমা কোম্পানীকে দিয়ে ঋণগুলি বিমা করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানিকে নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে এটা নিশ্চিত করে নেওয়া হচ্ছে যে ঋণ আদায় না হলে সুদসমেত ঋণের টাকা বিমা কোম্পানীর কাছ থেকে পেয়ে যাওয়া যাবে। তৃতীয়ত, বাড়ির বন্ধকী সমৃদ্ধ ঋণগুলিকে বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক বিভিন্ন বিনিয়োগকারী সংস্থা যেমন পেনশন ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড বা অন্য কোনও বৃহৎ আর্থিক সংস্থার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। এর ফলে একই ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে লাভবান হচ্ছেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক, ঋণ আদায়কারী সংস্থা, বিমা কোম্পানী সকলেই। কিন্তু ওই পশ্চিমী ব্যাঙ্কগুলি এটা ভেবে দেখেনি যারা ঋণ নিচ্ছেন তাদের আদৌ তা শোধ করার ক্ষমতা আছে কিনা।

ব্যাঙ্কগুলি এমন সব ব্যক্তিকে ধার দিতে শুরু করে যাদের আদৌ তা শোধ করার ক্ষমতাই নেই। এদিকে সহজ কিস্তিকে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে দেখে অনেকেই রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুতরাং বাড়ির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান দ্রুত কমতে থাকে। শেষে চাহিদার তুলনা যোগানের মাত্রা অধিক হয়ে যায়। দ্রুত পড়তে থাকে বাড়ির দাম। যারা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, বাড়ির দাম নিম্নমুখী দেখে তারা ঋণ শোধ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। সুতরাং একদিকে ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করার অক্ষমতা ও অন্যদিকে ঋণ শোধ করার সদিচ্ছার অভাব এই দুই-এর যাঁতাকলে পড়ে যায় ব্যাঙ্কগুলি। এমত উপার্জনহীন অবস্থায় বিমার জন্য নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে যাওয়া দ্রুত দেউলিয়ার পথে ঠেলে দেয় ব্যাঙ্কগুলিকে। বিশ্বের এই এতবড় অর্থনৈতিক সঙ্কট কিন্তু ধনতন্ত্রের উপরই এক বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। সেইসঙ্গে গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্টের উপরও চরম আঘাত হেনেছে। বস্তুত, বিশ্বায়নের কুফল কিন্তু পরিলক্ষিত হয়েছে এই অর্থনৈতিক তান্ডবে। যেখানে একটি দেশের আর্থিক সঙ্কট ছোঁয়াছে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে রোগগ্রস্ত করে তুলেছে বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে। প্রত্যেকটি বিপদেরই একটি মঙ্গলময় দিক থাকে। বিশ্বায়নের নামে প্রতিটি দেশের মধ্যেকার পাঁচিল যেভাবে দ্রুত খসে পড়ে তাদের স্বাভিমান ও মর্যাদা বোধকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এই অর্থনৈতিক সঙ্কটে তা হয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় বের করার সাথে সাথে এদেশের অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতি-বিদদেরও কিন্তু উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

> “
>
> **বিশ্বায়নের নামে প্রতিটি দেশের মধ্যেকার পাঁচিল যেভাবে দ্রুত খসে পড়ে তাদের স্বাভিমান ও মর্যাদা বোধকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এই অর্থনৈতিক সঙ্কটে তা হয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।**
>
> ”

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি

(৮ পাতার পর)

উৎপাদনে আমাদের আত্মনিয়োগ করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত। আগেই দেখিয়েছি আমাদের কয়লার ভাণ্ডার বর্তমান হারে ব্যবহার করলেও ২৫০ বছর লাগবে শেষ হতে। এটা নিশ্চিত যে কয়লার ব্যবহার আগের চেয়ে অনেক কমেছে এবং আরও কমবে। ঘরে ঘরে কয়লার ব্যবহার কমছে, কলে-কারখানায় ও রেল-পরিবহনে কয়লার ব্যবহার কমছে। উল্টোদিকে কয়লার নতুন নতুন ক্ষেত্র ও স্তর আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাই ভাণ্ডারও বাড়বে।

অন্যদিকে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের মূল উপকরণ ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার অতি ক্ষীণ। বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে;তার উপর আছে সরবরাহের বিভিন্ন শর্ত। আমেরিকার সঙ্গে যে পরমাণু চুক্তি হয়েছে তাতে নিরবচ্ছিন্ন পরমাণু জ্বালানি সরবরাহের পক্ষে আইনি বাধ্যবাধকতা কিছু রাখা হয়নি, শুধু রাখা হয়েছে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। অতএব আমেরিকার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কে সামান্য টানা-পোড়েন দেখা দিলেই পরমাণু জ্বালানি সরবরাহেও টান ধরতে বাধ্য। তাতে আমাদের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে নেমে আসবে বিপর্যয়।

এতো গেল একটা বিপদের দিক। আরও বিপদ হচ্ছে একটি বিপজ্জনক খনিজ পদার্থকে অহেতুক প্রাণী জগতে সহজলভ্য করে তোলা। যে সকল খনিজ পদার্থ প্রাণী জগতের হিতকারী, সেই সকল পদার্থ তার অনতিগভীরে প্রচুর পরিমাণে গচ্ছিত রেখেছে প্রকৃতি জগতের কল্যাণে। ইউরেনিয়াম প্রাণী জগতের হিতকারী নয় বলেই প্রকৃতি দেবী এই পদার্থটিকে অতি গভীরে অতি স্বল্প পরিমাণে লুকিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয়ই প্রকৃতি দেবীও চান না এই পদার্থটি মানুষ তাদের ব্যবহারিক জীবনে তুলে আনুক। কারণ এই পদার্থটির অপব্যবহার মানব জগৎকে ধ্বংস পর্যন্ত করে দিতে পারে।

‘মানব কল্যাণে পরমাণু ব্যবহার’-এর নাম করে আমেরিকাই একদিন সারা পৃথিবীতে ‘হাইলি এনরিচড় ইউরেনিয়াম’ (HEU) রপ্তানি করে গিয়েছিল। এই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ করে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো সহজেই যায়। প্রথমে বুঝতেই পারেনি এর পরিণাম। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উপর বিমান হানার পর ইউরেনিয়ামের যথেচ্ছ ব্যবহারের কুফল বুঝতে পারে। ফলে শুরু হয় ‘লো এনরিচড় ইউরেনিয়াম’ (LEU) ব্যবহার বাধ্যতামূলক। কিন্তু ততদিনে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদীরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কিনে ফেলেছে। এতে রিচার্ড বারের মতো বিশেষজ্ঞ বলেন, HEU বন্ধ করলে ক্যানসারের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে লাভও হল। ২০০৫ সালের ৮ আগস্টের পর থেকে আবার শুরু হল (HEU)-র অবাধ আদান-প্রদান। ১২৩ চুক্তিতেও শুনছি HEU আমদানীতে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। অতএব গত এপ্রিলের শিলংয়ের মতো ঘটনা ঘটতেই থাকবে। সেদিন শিলংয়ের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র থেকে ১ কেজি HEU খোয়া গিয়েছিল। সেটা যে মানব অকল্যাণকারী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে যাবে তা অনুমান করা যেতে পারে। এছাড়াও ১৯৭৯ সালে আমেরিকায় Three Mile Island Reactor দুর্ঘটনা এবং ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে চেরনোবিল রি-অ্যাক্টর অগ্নিকান্ডের মতো ঘটনা আরও ঘটতে পারে।

একদিকে পরমাণু প্রযুক্তি বানিয়ে পরমাণু শক্তি উৎপাদন বহু ব্যয়সাধ্য। অন্যদিকে মানব সমাজ ও প্রাণী জগত ধ্বংসকারী এই পরমাণু শক্তি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পড়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে আমরা থোরিয়াম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি। কারণ সারা পৃথিবীর গচ্ছিত থোরিয়ামের ৩৪ শতাংশই ভারতের দক্ষিণী উপকূলের বালুরাশিতে পাওয়া যায়। ডঃ ভাবা কিন্তু এই স্বপ্নই দেখেছিলেন। ইউরেনিয়ামের জন্য বিদেশের সেবাদাস হয়ে থাকার কী কারণ? সেটা ভাল করেই জানেন কংগ্রেস বাম-লালু-মুলায়মরা। তা না হলে রামসেতু ভাঙ্গার নাম করে থোরিয়ামের ভান্ডার ধ্বংস করার পথ তারা নিতেন না।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং

আমাদের প্রধানমন্ত্রী-র সদম্ভ উক্তি (২৩।৭-এর আনন্দবাজারে প্রকাশিত) "ওরা বামেরা (প্রকাশ কারাট ও এ বি বর্দ্ধন) চেয়েছিল আমি যেন ওদের ক্রীতদাস হয়ে থাকি।" অবশ্য এখন উনি মেমসাহেব সহ মুলায়েম, অমর ও খুনী সোরেনদের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চান। সংখ্যালঘু হয়ে, অন্যের সাহায্য নিয়ে গদীতে আসীন হয়ে থাকতে গেলে কারও না কারও ক্রীতদাস হয়ে থাকতেই হবে। অবশ্য উনি ক্রীতদাসের চেয়ে অনেক উপরের পোস্টে বা পদে (Post) এ আছেন। আছেন তো সোনিয়ার পেট হয়ে। এই পোস্টে কোনও বিপদের আশংকা নেই। তবে খুব শীঘ্র হয়ত সীতারাম কেশরীর মতো মেমসাহেবের মার খেয়ে রাহুলজীর জন্য সাধের গদী ছাড়তে হবে। তাছাড়া তিনি তো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি চরম করে রেখেছেন। আস্থা ভোট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ইস্যুতে হয়নি। তাহলে মনমোহন সিং গদী পেতেন না। গদী পেয়েছেন তো টাকার জোরে ও খুনী চোর-বাটপাড়ের ভোটে। অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তে ওদের কিছু যায় আসে না। কারণ ওদের তো বাজার থেকে কিছু কিনে খেতে হয় না। সবই পেয়ে থাকে ফ্রি তে — মাগনা। অনেক রাজনৈতিক নেতা-দাদারা, চোরেরা, মস্তানেরা, নেতারা, তোলাবাজেরা, ব্যুরোক্র্যাটরা (মহকুমা শাসক থেকে পেয়াদা পর্যন্ত) ও পুলিশ পর্যন্ত। সবাই বাজার ও দোকান থেকে মাগনা বা ফ্রিতে পেয়ে থাকে। আমি একজন সামান্য পেনশন ভোগী সত্তরোর্দ্ধ বৃদ্ধ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তে নাস্তানাবুদ। বিদেশী শাসন দেখলাম, স্বদেশী শাসন ও মেমসাহেবের শাসনে বেঁচে থাকতে হচ্ছে এটা বিরাট আক্ষেপ আমার। বিষেও ভেজাল, নয়ত আত্মহত্যা করতাম। এবার দেহ কেটে চেষ্টা করতে হবে মৃত্যুর। ডঃ মনমোহন শুধু দুর্বলই নন একজন নীতি ভ্রষ্ট। সৎ বলে যে প্রচার পেয়ে থাকেন সেটাও অন্যায় ভাবে। তিনি জীবনে ভোটে জিতে সাংসদ হননি। মেমসাহেবের কৃপায় পেছনের দরজা দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এমন প্রধানমন্ত্রীত্বে ধিক্।

রামনারায়ণ গুপ্ত, রাণীকুঠী, কলকাতা-৪০

মহামেডান স্পোর্টিং

আমি অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি। বহু কষ্টে আছি। ২০।৯।০৮ সংখ্যায় 'খেলার জগৎ' বিভাগের 'ময়দানে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার দূষিত পরিবেশ' শীর্ষক ক্রীড়া সংবাদটি পড়লাম। ভাল লাগল, সত্যি কথাই লিখেছেন। মোহনবাগান সচিব অঞ্জন মিত্রও ঠিকই বলেছেন। ডাঃ বিধান রায়ও বলেছিলেন। মহানগর ক্যালকাটার নাম বদলাতে পারে। তবে দুটি সামান্য ক্লাবের নাম বদলাতে অসুবিধা কোথায়। যে ক্লাবের হার-জিতে উৎসব ও শোকের চেহারা নেয়। সেই ক্লাবের নামে ধর্মীয় ও প্রাদেশিকতার ছোঁয়া থাকা উচিত নয়। নচেৎ ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে বা আশ্রয়দাতা এই বাংলায় 'ইস্ট পাকিস্তান', 'পাকিস্তান স্পোর্টিং' প্রভৃতি নামেও ক্লাব গড়ে উঠতে পারে। যাঁরা ভিটেহারা, ধর্ষণ, অত্যাচার করল তাদের সাথেই এখন জোট গড়ে ছবি তুলতে লজ্জা করে না। খাস ইস্টবেঙ্গলে ঢাকার বুকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গড়ে দেখাক না। অবিলম্বে মহামেডানের নাম হোক 'ইন্ডিয়ান স্পোর্টিং ক্লাব' ও ইস্টবেঙ্গলের নাম হোক 'বেঙ্গল ক্লাব'।

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, আতপুর, শ্যামনগর, উঃ ২৪ পরগনা।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। এদেশে অনেক বুদ্ধি মান মিলে ভারতের সংবিধান রচনা করলো। দেশ স্বাধীনের জন্য ভারতমাতার হাজার হাজার বীর সন্তান শহীদ হয়েছেন। কিন্তু আজ এই ভারতবর্ষে কতজন শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়? সংবিধানে লেখা হয়েছে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু আমার প্রশ্ন যদি এই ভূমি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে থাকে তবে কেন মুসলমানদের তোষণ করা হয়? কেন তাদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়? কেন সংরক্ষণ নীতি চালু? কেন নিষিদ্ধ 'সিমি'-র প্রতি আমাদের নেতারা সাফাই গেয়ে থাকেন? কেন তাদের দাবির কথা সকলে প্রথমে ভাবেন? হিন্দুরা কিছু বললে সাম্প্রদায়িক বলে চিৎকার করতে থাকেন? এটাই কী ধর্মনিরপেক্ষ দেশের চরিত্র হওয়া উচিৎ? ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ভুলের জন্য ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হলো। কিন্তু সংসদে হামলাকারী আসামী আফজল গুরুর কেন ফাঁসি হলো না? এর জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন অমান্য করা হচ্ছে? কেন অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি নরম ভাব প্রয়োগ? তাই যদি হয় তবে ধর্ম নিরপেক্ষ বলতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

শ্যামলকান্তি নাথ, উত্তর কাছাড়, অসম।

ন্যানো ঃ নিখরচায় বিজ্ঞাপন

সত্যি, একেই বলে রতনে 'রতন' চেনে। টাটা কোম্পানীর কর্ণধার রতন টাটা এমন দু'খানা রত্ন ধারণ করেছেন যার ফলে তিনি ন্যানো গাড়ির প্রচার অভিযানে একদম সস্তায় কিস্তিমাত করে ফেলেছেন। এই পরম রত্নদের মধ্যে একটির নাম মমতা অন্যটির নাম বুদ্ধ। আর সারা দেশের এক শ্রেণীর সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রকে বলা যায় নিখরচায় টাটার ন্যানো গাড়ি প্রচার অভিযানের জন্য এক একটি রত্ন ভান্ডার। সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে এর চেয়ে আরও অনেক বড় প্রোজেক্টের কাজ হয়েছে এখনো চলছে অনেক প্রোজেক্ট। যেখানে অধিগ্রহণের নামে গুন্ডাবাজি ধান্দাবাজি হয়েছে। সেখানেই হয়েছে এমনই সব স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের হৈ-হল্লা। যারা প্রোজেক্টের কর্ণধার তারা কৃষকদের এক একটি নগণ্য মূল্যহীন মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করার ফলেই এই সব ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। রতন টাটার মানসিকতায় তেমনই কিছু পরিচয় পাওয়া যায় সিঙ্গুর-কান্ডের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে। শুধু সিঙ্গুরেই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এমনই অবিবেচক কাজকর্মের জন্য অসমাপ্ত রয়েছে তাদের প্রোজেক্টের কাজকর্ম। ওইসব কারখানা এখন পরিত্যক্তই বলা যেতে পারে। সিঙ্গুরও হয়তো চলছে একই পথ ধরে।

যাই হোক, সিঙ্গুরে না হয়ে যদি কারখানা অন্য কোথাও হয়, তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। ন্যানো গাড়ি সিঙ্গুর কান্ডে যেভাবে একটা বিরাট প্রচার পেয়ে গেলো, তাতে গাড়ি বাজারে এলেই ক্রেতাগণ যে লুফে নেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই জন্য মমতা এবং বুদ্ধদেবের প্রতি রতন টাটা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবেন। তবে ন্যানো ভক্তগণের হতাশার কোনও কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের সার্থরক্ষার মহানুভবতা নিয়ে রতন টাটা সিঙ্গুরে শিল্প আঙ্গুরের চাষ-আবাদ করতে আসেননি। তিনি এসেছেন তার ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য। কারণ পূর্বাঞ্চলে রপ্তানী যোগ্য বন্দর শহর কলকাতা, হলদিয়া এবং পারাদ্বীপ বন্দর।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তার এই আংশিক গাড়ি নির্মাণের ছোট একটি কারখানা। এ নিয়ে হৈচৈ করার মতন কিছু নেই। সাংবাদিকদেরও সংবাদ প্রকাশে একটু সংযত হওয়া উচিত। কারণ সিঙ্গুর এখন ন্যানো গাড়ি এবং বুদ্ধ, মমতার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের একটি নিখরচায় বিজ্ঞাপনের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল

'মহাভারত কি ব্যাসদেবের আত্মজীবনী?'-শীর্ষক নিবন্ধে স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা-১৪৯৫, (যুগাব্দ ঃ ৫১১০)-মানিকচন্দ্র দাস খৃঃ পূঃ ৩০৬৭, ২২ নভেম্বর এবং খৃঃ পূঃ ৩০৬৬, ১৭ জানুয়ারি, তারিখ দুটিকে যথাক্রমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভ এবং ভীষ্মের মহাপ্রয়াণের দিন বলে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, মহাভারতে বিবৃত ব্যাসদেবের নক্ষত্রলিপি থেকে নির্ণীত ঐ তারিখ দুটি 'নাসা' ও 'ইসরো' দ্বারা স্বীকৃত। তারিখ দুটি মেনে নিতে অসুবিধা আছে। দুটি কারণ ঃ (১) যুদ্ধারম্ভ ২২ নভেম্বর থেকে ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ পরবর্তী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট সময়কাল-৫৭দিন। অপরদিকে, মহাভারতে ব্যাসদেব বলেছেন — ১০দিন যুদ্ধের পর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত ভীষ্ম ৫৮ দিন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের ৬৮ (১০+৫৮) দিন পরে ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। শ্রীদাসের বক্তব্য মানতে হলে, মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৬৭ তম অধ্যায়টি নতুন করে লিখতে হয়। (২) এখন (২০০৮ খৃস্টাব্দ) ৫১১০ যুগাব্দ চলছে। কিন্তু, শ্রীদাসের গণনা অনুসারে তা হবে যুগাব্দ : ৫০৪০: এবং স্বস্তিকা সাপ্তাহিকেও এক বৎসর কাল যুগাব্দ : ৫১১০-এর স্থলে লিখতে হবে যুগাব্দ : ৫০৪০।

প্রসঙ্গত, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নিয়ে হরেক জনের হরেক মত আছে, কমপক্ষে গোটা দশ — পরিসর, ৫৭৫ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত। ঐ তালিকায় শ্রীদাসের উল্লেখ করা তারিখ দুটি নেই। 'নাসা' ও ইসরো' দ্বারা স্বীকৃত ঐ তারিখ দুটির উদ্ভাবক কে বা কারা তা জানা গেল না। তবে, খৃঃ পূঃ ৩১৩৭ সালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে ঐতিহ্যসম্মতরূপে স্বীকৃত এবং তা অমূলক নয়। মহাভারত সূত্রে প্রাপ্ত ঐ সময়ের গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান বিচার-বিশ্লেষণ করে দুজন বিশেষজ্ঞ, N. Jagannatha Rao এবং A. N. Chandra খৃঃ পূঃ ৩১৩৯ সালকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। শ্রীরাও তাঁর The Age of Mahabharata War পুস্তকে বলেছেন — "The present kaliyuga commenced in 3102 B.C. and The Mahabharata War took place before that date in about 3139 B.C."। শ্রীচন্দ্র ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তাঁর The Date of Kurukshetra War পুস্তকে বলেছেন – "....Hence the year of the Kurukshetra war comes to near about 3139 B.C. and this is very near to the traditional date of 3137 B.C. which should be accepted very justifiably as the period of the Kurukshetra war." ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী তাঁর 'কল্যব্দ' পুস্তিকাতে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।

চিঠিপত্র

পরিশেষে আর একটি কথা, শ্রীদাস প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, রামেশ্বর ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সমুদ্রতলে রামচন্দ্র নির্মিত সেতু 'নাসা' ও 'ইসরো' মেনে নিয়েছেন। 'ইসরো'-র কথা জানি না, তবে 'নাসা' কর্তৃপক্ষ যে তা বলেননি দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয়ের নিবন্ধ, ('রামসেতুর গঠন তথা শৈলীই বলছে এটা মানুষের তৈরি'-স্বস্তিকা দীপাবলী সংখ্যা-১৪১২), পড়লেই তা জানা যাবে। উপরন্তু, অশোক কুমার সিংহ 'তর্ক বিতর্কের জালে রামসেতু' শীর্ষক নিবন্ধে ('বর্তমান, ২৭.৪.০৮) জানিয়েছেন, সেতু বিতর্কের ঝামেলা এড়িয়ে যাবার জন্য 'নাসা' কর্তৃপক্ষ বলেছেন — আদম ব্রিজের উপর পাওয়া তথ্য আমরা প্রকাশ করেছি। এর সাথে রামায়ণে বর্ণিত রামসেতুর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করতে চাই না।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

যে হেঁয়ালির জবাব নাই

অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

জনমত

গত ২১-৯-০৮ এর সংবাদপত্রে সবাই নিশ্চয় খবরটা পড়ে থাকবেন। এবং পড়েই চমকে উঠেছেন। কারণ খবরটা এত অবিশ্বাস্য যে প্রত্যেকে এটাকে বিরাট এক হেঁয়ালি বলে স্বীকার না করে পারবেন না। খবরটা সংক্ষেপে এই যে গত ২৫।৮।০৮ , অর্থাৎ দিল্লীতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের (১৩-৯-০৮) আঠারো দিন আগে কলকাতার মার্কিন দূতাবাসে চার সন্ত্রাসবাদী "সিমি" নেতার সঙ্গে মার্কিন কর্তা ডগলাস কেলির কয়েক ঘন্টার বৈঠক হয়। বছর কয়েক (২২ জানুয়ারি, ২০০২) আগে এই মার্কিন দূতাবাসেই ইসলামি জেহাদিরা আক্রমণ চালিয়ে কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করেছিল। গোয়েন্দা বিভাগের এ ডি জি নপরাজিত মুখোপাধ্যায় অতিগোপন রিপোর্টে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ঐ বৈঠকের কথা জানিয়েছেন। ডগলাস পাবলিক এ্যাফেয়ার্সের প্রধান, এবং তিনি মুর্শিদাবাদে গিয়েও কিছু ব্যক্তির সঙ্গে গোপনে দেখা করেন। খবরটা পড়ে দেশ সচেতন যে কোনও ভারতীয় স্তম্ভিত হবেন, কারণ ব্যাপারটা হেঁয়ালি অনেক দিক থেকেই। সিমির মতো নিষিদ্ধ ঘোষিত ভারত বিরোধী এক ঘোর সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে তাদের জাত শত্রু আমেরিকার এক আমলার গোপন সাক্ষাৎকার তো শুভেচ্ছামূলক হতে পারে না কোনও যুক্তিতেই। এবং তাও ভারতে বসে! গোলমেলে ব্যাপার নিশ্চয়ই। সবাই জানে যে ওসামা বিন লাদেনের প্রেরণায় মুসলমান মাত্রেই প্রতিটি আমেরিকানকে খুন করার অঙ্গীকারে বদ্ধ। আমেরিকাও লাদেনকে জ্যান্ত ধরা বা হত্যার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ন্যাটোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলিম জগৎকে ঠাণ্ডা করার বিরাট এক পরিকল্পনার হোতা আমেরিকা। লাদেনের কাছ থেকে এগারো সেপ্টে স্বরের ধাক্কার ক্ষত আজও আমেরিকার শুকায়নি, গোটা জগতের কাছে তাকে বে-আব্রু করে দিয়েছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হান্টিংটনের "ক্ল্যাস্ অব্ সিভিলাইজেশন্" গ্রন্থের ভবিষ্যৎ বাণীর অনুসরণে আমেরিকার নেতৃত্বে খৃস্টান জগৎ ইসলাম জগতের সঙ্গে অঘোষিত লড়াইয়ে ব্যাপৃত। এটাই ওদের ধর্ম নির্দিষ্ট চিরন্তন সম্পর্ক। এহেন সাপে - নেউলে সম্পর্কের দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে হঠাৎ গোপন প্রেম-প্রীতির সম্পর্কের খবরে সচেতন জনগণের ভ্রূ কোঁচকাবেই। এতো সেই "মুখে বলি হরি। কাজে অন্য করি"- হয়ে যাচ্ছে। আবার বিপরীতটাও লক্ষ্য করুন। গত অর্ধশতাব্দি ধরে ভারত আমেরিকার সম্পর্কের ইতিহাস। স্বাধীনতার লড়াইয়ে ইংরাজ শাসককে বিতাড়িত করলেও ভারত কমন্‌ওয়েল্‌থের সঙ্গে গাঁট -ছড়া ছিন্ন করেনি, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে ভারতকে পাশে পেতে আমেরিকার আন্তরিক প্রস্তাবেও ভারত সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা বামপন্থী রাশিয়ার প্রেমে মত্ত নেহরু আণবিক শক্তির প্রশ্নে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেও আমেরিকাকে প্রত্যাখ্যান করে। আমেরিকা কিন্তু আজও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে জোট বাঁধতে চায়। দেড় দশক আগে মার্কিন সেনেটর ল্যারি প্রেসলার ভারতকে সাবধান করে বলেও ছিলেন, ভারত, তুমি সাবধান। মুসলিম দেশগুলো তোমাকে ঘিরে ফেলছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রশ্নেও চীনের বিরুদ্ধে ভারতের বিশাল বাজার আমেরিকার দরকার। গত পাঁচ ছয় বছর ধরে অসামরিক পারমাণবিক চুক্তিতে ভারতকে রাজি করাতে মার্কিন সরকার আদাজল খেয়ে লেগেছে। ভারতেরও একান্ত স্বার্থেই এটা দরকার, কিন্তু গরজ যেন একা আমেরিকার। এইভাবে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রশ্নে ভারত ও আমেরিকার জোট বিশ্বের স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন।

আমেরিকা এটা বেশি বোঝে বলেই গত চারদশক ধরে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও পারস্পরিক স্বার্থেই হাত বাড়িয়েই রেখেছে। এমতাবস্থায় ডগলাসের ভূমিকা তো বেসুরো ঠেকবেই। কোনও যুক্তিতেই ধরা যাচ্ছে না। যে মুসলিম সন্ত্রাস গোটা বিশ্বের মাথা ব্যথা এবং একমাত্র যে আমেরিকাই আক্ষরিক অর্থে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সন্ত্রাস বিরোধী একটা কার্যকরী পরিমণ্ডল এশিয়ায় গড়ে তুলতে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট, তারই একজন

(এরপর ১৩ পাতায়)

পরম্পরা

সোমনাথ নন্দী

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী

বাংলার মাটি একান্তভাবে মাতৃময়। মাতৃভক্তিই বাংলার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে বিশ্বজননীর আরাধনায়। বলা যায় মাতৃ আরাধনার উদ্ভব, বিকাশ, স্থায়িত্ব বাঙালীর মাতৃ ভাবনার চিরন্তন প্রবাহ যা ভারতের অন্যত্র কম দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত সকল জ্যোতির্ময় মহাপুরুষদের সাধনা ও মননে মাতৃসাধনা লাভ করেছে এক বেগবতী স্রোতস্বিনীর ধারা। দেবী সেখানে পরব্রহ্মস্বরূপিণী, পরম চৈতন্যময়ী, পরম জ্যোতিস্বরূপা। তার আভাস পাওয়া যায় শ্রী শ্রী চন্ডীর একটি স্তুতিতে — সর্বরূপময়ং দেবী সর্বম্ দেবীময়ম্ জগৎ/অতোহং বিশ্বরূপম্ ত্বং নমামি পরমেশ্বরীং।

স্তুতির আধারভূতা দেবী অবশ্য হলেন জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী। যিনি অপরূপ রূপলাবণ্যশালিনী। যাঁর ইচ্ছায় বিশ্ব আন্দোলিত, কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় — ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁর মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন না, যাঁর আদি অন্ত নেই তিনিই সেই সর্বভূতরূপা আদি জননী জগদ্ধাত্রী। শ্রীশ্রী চন্ডীর দশম অধ্যায়ের ৫-ম শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে উক্ত বিষয়ের পরিপুষ্টতা — একৈবাহ্য জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। অর্থাৎ জগতে আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কে? একই বার্তা পাই শ্রীশ্রী চন্ডীর অন্যত্র — বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি সংহার কারিণীম্।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলছেন — জগদ্ধাত্রী রূপের অর্থ জানো। যিনি জগতকে ধারণ করে রয়েছেন। তিনি ধারণ না করলে জগত পড়ে যায় — নষ্ট হয়ে যায়। মন করিকে (মন হস্তি) যিনি বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

চন্ডীর আখ্যায়িকা অনুসারে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার অন্যরূপ জগদ্ধাত্রী। সেখানে দেখা যাচ্ছে দেবতারা দেবীর অর্চনা করেছেন দিব্য কুসুমে, স্বোৎসারিত স্তবপুষ্পাঞ্জলিতে — অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ।

কাত্যায়নী তন্ত্রে দেবীর উদ্ভবের একটি কাহিনী দেখা যায়। আখ্যানটি কেনোপনিষদের আখ্যানের প্রায় অনুরূপ। দানবদের স্বর্গ হতে বিতাড়িত করে একবার দেবতাদের মধ্যে নিজ নিজ সামর্থ বিষয়ে অহঙ্কার দেখা দিল। তাদের মদান্ধতাকে বিনাশের জন্য দেবী পরাশক্তি আবির্ভূতা হলেন কোটি সূর্যসম জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে। অপরূপা দেবীকে দর্শন করে বিহ্বল বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, বরুণদেব। দেবীর পরিচয় জানতে চাইলেন তাঁরা। কিন্তু দেবী পক্ষান্তরে চাইলেন তাঁদের পরিচয়।

এগিয়ে এলেন অগ্নি। বললেন স্পর্ধাভরে — আমি অগ্নি। আমি মুহূর্তে সারা বিশ্বকে দগ্ধ করতে পারি। দেবী বললেন, বেশ তোমাকে এই তৃণ খন্ডটি দিচ্ছি। দহন করে প্রদর্শন করো তোমার শক্তি। অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। পারলেন না সামান্য তৃণখন্ডটি দগ্ধ করতে। হারিয়ে গেল তাঁর শক্তির দম্ভ। এবার পালা বায়ু অর্থাৎ পবনদেবের। তিনি গর্বিত সুরে বললেন — আমি মুহূর্তে বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে স্থানচ্যুত করতে পারি। দেবী তৃণখণ্ডটি এগিয়ে দিয়ে বললেন — বেশ, তুমি তৃণখণ্ডটিকে স্থানচ্যুত করে দেখাও।

পবনদেব সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তৃণখণ্ডটি নড়াতে পারলেন না। মাথা নিচু করে সরে গেলেন তিনি। একইভাবে পর্যুদস্ত হলেন বরুণ ও চন্দ্র। চার দেবতা বুঝলেন এতক্ষণ তাঁরা যে শক্তির বড়াই করেছিলেন, তা তাঁদের নিজস্ব নয়। সুতরাং অহঙ্কারও ভিত্তিহীন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁরা দেবীর প্রসন্নতা অর্জনে নিমগ্ন হলেন। বুঝলেন এই জ্যোতির্ময়ী দেবীই সমস্ত শক্তির উৎস। তিনিই জগতের রক্ষাকর্ত্রী ও পালিকা। এই দেবীই জগদ্ধাত্রী। উক্ত দেবতাদের স্তবগানে তারই পরিচয় পাওয়া যায় — আধারভূতে চাধয়ে ধৃতিরূপে ধুবন্ধরে / ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে।

আগেই বলা হয়েছে জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী দুর্গার চতুর্ভূজা রূপ। শ্রীশ্রীচন্ডীর পঞ্চ তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে মহাসরস্বতীর ধ্যানে উক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে — তিনি সিংহারূঢ়া, শশিশেখরা, মরকতমণি তুল্য দিব্য প্রভাযুক্তা। চার হাতে তাঁর শঙ্খ চক্র ধনুর্বান। ত্রিনয়নী তিনি। কেয়ুর, চন্দ্রহার, বলয় ও নুপুর পরিহিতা ও রত্নোজ্বলকুন্ডল শোভিতা।

ষোড়শ শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর তন্ত্রসারে দেবীমূর্তির যে বর্ণনা করেছেন, তা হল চতুর্ভূজা মহাদেবী নানা অলঙ্কার ভূষিতা। সিংহপৃষ্ঠে আসীনা। নাগযজ্ঞোপবীতধারিনী। বাম দুই হস্তে শঙ্খ ও শাঙ্গধনু। দক্ষিণ দুই হাতে ধৃত চক্র ও পঞ্চ বাণ। তিনি প্রভাত সূর্যসম রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা। নারদাদি মুনিদের দ্বারা পূজিতা। পদতলে করিন্দ্রাসুরের অর্থাৎ মহিষাসুরের হস্তিরূপী ছিন্ন মুন্ড।

দুর্গাপুজোর একমাসের মধ্যে কার্তিকী শুক্লপক্ষে হয় জগদ্ধাত্রীর আরাধনা। নিদান পাওয়া যায় শূলপানির কাল বিবেক গ্রন্থে। সেখানে লক্ষণীয় শ্লোকটি হল — কার্তিকেহমলপক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমেহহনি/ পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠেনিষেদুষীম্।।

ঐতিহাসিক সূত্র অনুসারে বাংলায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তক নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ছিলেন প্রবল শাক্তধর্ম অনুরাগী। তিনি দেবীর আরাধনা করেছিলেন বিপদ মুক্তির কারণে।

কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁয়ের রোষে কারারুদ্ধ হন। সম্ভবত রাজস্ব নিয়ে বিরোধের কারণে। কারামুক্তির পর মুর্শিদাবাদ থেকে জলপথে নবদ্বীপ ফেরার সময় শুনতে পান ঘাটে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের বাজনা। সে বছর মাকে পূজা করতে না পেরে তিনি দারুন মনোবেদনায় আচ্ছন্ন থাকেন। সে সময় দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন কার্তিকী শুক্লা নবমীতে তাঁর পূজা করতে ষড়োশপচারে। সেই শুরু। কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী পূজায় প্রভাবিত হলেন তার চন্দননগরের বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। চন্দননগরে সুপ্রসিদ্ধ জগদ্ধাত্রী পুজোর পথিকৃৎ তিনি। বলা যায় তাঁরই প্রেরণায় চন্দননগর আর জগদ্ধাত্রী পুজো সারা দেশে সমার্থক হয়ে উঠেছে।

আজ বারোয়ারি বলে যে শব্দটি চোখে পড়ে তার পথপ্রদর্শক কিন্তু গুপ্তিপাড়ার ১২ জন উদ্যোক্তা বা বন্ধু। তাঁরা শুরু করে অঞ্চ ল থেকে চাঁদা তুলে সার্বজনীন পুজো। সে পুজোর পূজিতা দেবী ছিলেন জগদ্ধাত্রী। ১৮২০ খৃস্টাব্দে ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় ছাপা হয় সে খবর। বারোয়ারি বা সার্বজনীন পুজোর সেই সূত্রপাত। যে পুজো আগে ছিল ভাবগাম্ভীর্যে পূর্ণ, আজকের ভোগবাদী নিম্নরুচি মানুষদের কল্যাণে তা হয়েছে হাইটেক অন্তঃসারশূন্য উৎসব মাত্র।

আকাশ দীপ

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য

মহালয়ায় পিতৃলোক থেকে নেমে এসেছিলেন পিতৃপুরুষরা। তপর্ণের মাধ্যমে উত্তরপুরুষরা তৃপ্ত করেছিলেন তাঁদের। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষে মাতৃবন্দনায় মুখর হয় সকলে। দেবীপক্ষের সেই আনন্দঘন দিনগুলিরও হয় অবসান। পিতৃপুরুষরা এবার ফিরে যাবেন আবার পিতৃলোকে। তাঁদের সেই যাত্রাপথকে আলোকিত করতে আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি-সময়কাল পর্যন্ত মরলোকের উত্তরপুরুষরা জ্বালায় আকাশ প্রদীপ। প্রার্থনা, হে পিতৃগণ, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক, মঙ্গলময় হোক। তোমরা আশীর্বাদ করো এমনিভাবেই আমরা যেন তোমাদের তর্পণ করতে পারি। তোমাদের তৃপ্ত করতে পারি। তোমাদের স্মরণ করে ধন্য হতে পারি। তোমাদের চলার পথে আলো দেখিয়ে যেন নিজেরাই অন্ধকার থেকে আলোর পথে চলতে পারি।

আকাশ প্রদীপ দেওয়া হয় সাধারণত অন্তরীক্ষলোকের দেবতাদের উদ্দেশ্যে, দেওয়া হয় পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে। আকাশ প্রদীপ দান একটি লৌকিক আচার। এরসঙ্গে ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতি ছাড়াও জড়িয়ে আছে একটি বাস্তব কারণও। এই সময়ই শ্যামাপোকা জাতীয় বিভিন্ন পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বাঁশের মাথায় উঁচু করে রাখা দীপে আকৃষ্ট হয়ে তারা সেদিকে ধেয়ে যায় এবং আগুনে

পুড়ে মারা যায়। মানুষ রেহাই পায় তাদের অত্যাচার থেকে। সেইসঙ্গে অন্যকোনও কীটনাশক না দিয়েই রক্ষা করা যায় শস্য ও ক্ষেতের ফসল।

এছাড়া রয়েছে আরও একটি কারণও। আশ্বিনের শেষ থেকেই পড়তে থাকে শিশির। গাঢ় হতে থাকে কুয়াশাও। কুহেলি ভরা রাতে পথিককে আলোর সন্ধান দেয় এইসব আকাশপ্রদীপ। আর সেই কারণেই আকাশ প্রদীপ লৌকিক জীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে। ধর্মসাধন, শস্য সংরক্ষণ, পতঙ্গনিবারণ ও পরহিতব্রতের যন্ত্র নিয়ে।

আকাশ প্রদীপের এই তাৎপর্য ছাড়াও রয়েছে আরও একটি ধর্মীয় তত্ত্ব। এই সময় উঁচুতে যেমন স্থাপন করা হয় আকাশ প্রদীপ, ঠিক একইভাবে দীপ দেওয়া হয় বিষ্ণুমন্দিরে এবং তুলসীতলাতেও। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে এইভাবে কার্তিকমাসে বিষ্ণু মন্দিরে প্রদীপ দিলে তুষ্ট হন মাধব। সেইসঙ্গে দীপদাতা অর্জন করেন অশেষ পুণ্য। তাঁর পরলোকের পথ আলোকিত হয় এই দীপদানের পুণ্যে। ঘি বা তিল তেল দিয়ে জ্বালানো হয় এই প্রদীপ। এইভাবে বিষ্ণু মন্দিরে প্রদীপ দিলে হয় পাপবিনাশন। দীপদাতা হন অশেষ পুণ্যের অধিকারী। গয়ায় পিণ্ডদান তৃপ্ত হন পিতৃপুরুষ আর কার্তিকমাসে দীপ দানে তুষ্ট হয় স্বয়ংসাধক হরি বিষ্ণু। বিশেষ করে কার্তিকের দ্বাদশীতে দীপদান ও বিষ্ণুপূজা অবশ্য কর্তব্য।

বিষ্ণু মন্দিরে প্রদীপদান ছাড়াও কার্তিকের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে চৌদ্দপ্রদীপ দান এবং অমাবস্যার দীপাবলীর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায় এই আলোর উৎসব।

বর্তমানে প্রদীপের বদলে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে বা নানারকম রঙিন আলো জ্বালিয়ে অতীতের সেই ঐতিহ্যকেই বহন করে চলেছে মানুষ। মূলত এই দীপ দানের মাধ্যমে প্রসার ঘটে চিত্তের। নিজের অজান্তেই পরহিতব্রতের অনুষ্ঠান। আর সেই কারণেই আকাশপ্রদীপ বা দীপ দানকে নিঃসন্দেহে এক মহান ঐতিহ্যের অনুবর্তন বলে অভিহিত করা যায়।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

পণ প্রথার বিরুদ্ধে বাস্তবে প্রতিবাদী দুর্গা

ইন্দিরা রায়

শারদোৎসবের সূচনা হল দুর্গাদুর্গতিনাশিনীর আরাধনা দিয়ে, তারপরই চলেছে দেবীর বিভিন্ন রূপের পূজা। নারীর প্রতীক দেবী দুর্গা। নারীই শক্তি। তাই তো দেবতাদের দেওয়া বিভিন্ন শক্তিতে সৃষ্টি হয় দেবী। এই প্রসঙ্গে নারীই যে শক্তি এমনই এক নারীর কথা এই সংখ্যায় তুলে ধরা হচ্ছে — যে এই বাস্তবের প্রতিবাদী দুর্গা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক নারী।

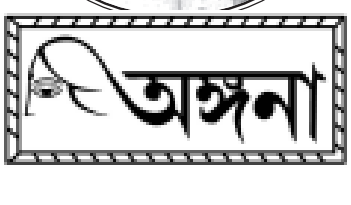

বাংলার সমাজে শুধু যেন, পৃথিবীতে কন্যা সন্তানের জন্ম শুধুমাত্র অন্যের ঘরে ঘরণী হওয়ার জন্য এবং তাও অর্থের বিনিময়ে। সমাজ ব্যবস্থায় যতই পরিবর্তন আসুক না কেন, কি শিক্ষা কি মানসিকতা কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা আজও পণের বলি। কোনও নারী যতই শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হোক না কেন, পাত্রপক্ষের কাছে অর্থের বিনিময়ে তারা অবস্থান। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঘটে যায়। এ যুগে প্রত্যন্ত গ্রামের এক মহিলা নিরুপমার দশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে এক বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এবার আসল ঘটনায় আসা যাক। পশ্চি ম মেদিনীপুরের ঘাটালের কোন্নগর গ্রামের মিতা পোড়ে। পাত্র ওই গ্রামেরই ছেলে সাগর, পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। মিতা ওই একই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। কিন্তু বিয়ের কথাবার্তা হয় অভিভাবকদের মাধ্যমে। তাঁরাই সাগর-মিতার বিবাহের দিন স্থির করেন গত ফেব্রুয়ারিতে। সঙ্গে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী দান হিসেবে দিতে হবে একথা হয় এবং মিতার বাবা যুগলকিশোর পোড়ে রাজিও হন। সেই সঙ্গে হবু জামাই সাগরের দাবি মতো নগদ

একান্ন হাজার টাকা দিতেও রাজি হন যুগল কিশোর। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রণ -পত্র এবং আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা শেষ। হঠাৎ বিয়ের একদিন আগে সাগর ও তাঁর পরিবারের লোকজন হবু বউ-এর বাবার কাছে আরও এক লক্ষ টাকা দাবি করেন। এই টাকা না দিলে মিতাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় এ কথাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো যুগলবাবুর মাথায় হাত পড়ল। তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবাকে ভেঙে পড়তে দেখেও কিন্তু পাত্রী মিতা পাত্র সাগরের এ হেন লোভী নির্লজ্জ মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। আইনজীবী সুশীল মাহাতো ও পিনাকী ভট্টাচার্যর মারফত মিতা অভিযোগ করেন, এমন ছেলেকে বিয়ে করা কোনও মতেই সম্ভব নয়। ওই ছেলের জেনে রাখা উচিত মেয়েরা দোকানের খেলনা নয়। বিয়ে করার জন্য যে পাত্র টাকা দাবি করে, তিনি আর যাই হোক মানুষ নন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'র ছোট গল্প 'দেনাপাওনা'র নিরুপমা নীরবে সব অত্যাচার সহ্য করলেও বিয়ের আসনে বসার আগেই গ্রামের মেয়ে মিতা পণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সাগর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় প্রতারণার অভিযোগ করে এফ আই আর করেন। বিয়ের পাত্রীর বক্তব্য শুনে বিচারপতি দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও বিচারপতিপ্রণবকুমার দেবের ডিভিশন বেঞ্চ অভিযুক্ত সাগরের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিলেন। গ্রেপ্তার এড়াতে হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেন পাত্র সাগর ও তাঁর মা বীণা দাস ও ভাই। কিন্তু আবেদন মঞ্জুর তো নয়ই, বিচারপতিদ্বয় পাত্রপক্ষকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন। সাগরের পরিবার এই নির্দেশ পেয়ে ভয় পেয়ে যান। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে আবার আগের প্রস্তাবমত মিতা পোড়েকে বিয়ে করতে রাজি হয় পাত্র সাগর। এ প্রস্তাবে মিতার বাবা কিছুটা আশ্বস্ত হলেও বিরোধিতা করল পাত্রী মিতা নিজেই। সেই সঙ্গে সোচ্চারে জানিয়ে দেন, বিয়ে করার জন্য যিনি টাকা চান, তার যথাযথ শাস্তি হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমা রুখে দাঁড়াতে পারেনি, কিন্তু তাঁর স্বামী বাবার, বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে পাত্রী নিজেই প্রতিবাদী। কন্যাদায়গ্রস্ত যুগলবাবুকে সম্মানের আসনে বসাল তাঁরই আত্মজা।

আজকের দিনে মিতা পোড়ের মতো যদি অধিকাংশ নারী প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তাহলে সমাজে পণপ্রথার মত জঘন্য বর্বর প্রথার অবসান ঘটতে পারে। পণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারে। আজকের নারী স্বাধীনতার দিনেও শিক্ষিত স্বাবলম্বী মহিলারা অর্থের বিনিময়ে পাত্রস্থ হতে দ্বিধা করেন না। অনেকক্ষেত্রে তারাই বাবা-মার কাছে নানা দাবি তুলে চাপ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়, শিক্ষা তাদের মানসিক উৎকর্ষতা বাড়াতে পারেনি। স্বার্থপর অর্থলোলুপ মনোভাবই স্পষ্ট। এইসব কিছু মহিলাদের জন্যই আজও পাত্রপক্ষ যৌতুক ও পণ দাবি করতে দ্বিধা করেন না। পাত্রীর যোগ্যতা, শিক্ষার কোনও মূল্য থাকে না। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষিত উদার বলিষ্ঠ মনের প্রতিবাদী মিতা ঘৃণার সঙ্গে তার হবু স্বামীকে শেষ মুহূর্তে ত্যাগ করতে বাধ্য হল। আজকের দিনের আশার আলো এটাই যে, গ্রামাঞ্চ লে যেদিন বিপ্লব ঘটবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে, সেদিনই হবে প্রকৃত পণপ্রথার অবসান। মিতা পোড়েই তা সূচনা করলেন।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। কুড়ি

শিলচরে মহিলা সুরক্ষা সম্মেলন

সংবাদদাতা।। গত ১৯ অক্টোবর অসমের শিলচর কল্যাণ আশ্রমে মহিলা সমন্বয় মঞ্চে র উদ্যোগ এক মহিলা সুরক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতি সুমিত্রা দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন শ্রীমতি কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। মুখ্য বক্তারূপে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সহসেবা প্রমুখ সুনীতা হলদেকর বলেন, একটি সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে (১) সামাজিক সমরসতা (২) সুরক্ষা (৩) সমৃদ্ধি এবং সামাজিক সচেতনা ও সংস্কার জানা অপরিহার্য। হাজার বছর ধরে হিন্দুত্ব বিরোধী শক্তির দ্বারা ভারত খন্ডিত ও বিভাজিত হয়েছে। এতে নারীরাই ছিলেন তাদের প্রধান শিকার। এই ধারা এখনও অব্যাহত। এই প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহিলারা কিভাবে হিন্দুত্ব বিরোধী শক্তির দ্বারা নিগৃহীত এবং অসুরক্ষিত তার ব্যাখ্যা করেন।

মাতৃশক্তি তথা মহিলাদের সচেতনতা এবং সংগঠিত ভাবে হিন্দুত্ব বিরোধী শক্তি প্রতিহত করার তিনি আহ্বান জানান। কারণ মাতৃশক্তি জাগরণেই সমৃদ্ধ সমাজ গঠন সম্ভব।

এই সম্মেলনে ১০৫ জন সচেতন ও বিশিষ্ট মহিলা উপস্থিতি ছিলেন।

বিজেপির 'রাজনীতি' এবং আনন্দবাজারের ব্যবসায়িক সত্য

বিশাখা বিশ্বাস

"তাহারা রাজনীতি করিতে আসিয়াছে এবং যে পথে ভোট আসিবে তাহারা সেই পথেই রাজনীতি করিবে" (সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার, তাং-১৫-১০-০৮)। বক্তব্যের লক্ষ্য বিজেপি, 'পথ' হচ্ছে বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতা।

উল্লেখ নিস্প্রয়োজন যে "তাহারা রাজনীতি করিতে আসিয়াছে" বলেই আনন্দবাজার ও তজ্জাতীয় সংবাদপত্র এবং সংবাদ মাধ্যমগুলির 'টিকির মনিব' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পার্টি শতকরা আশি ভাগ হিন্দুর টাকায় শতকরা বাইশ ভাগ মুসলিম মোল্লা - মৌলবী মাদ্রাসা এবং কেবল মুসলিম ছাত্র ছাত্রীর সেবা করে চলেছে কেবলমাত্র আনন্দবাজারের উল্লিখিত 'ভোটের' জন্য। এটাও লেখা বাহুল্যমাত্র যে "তাহারা রাজনীতি করিতে আসিয়াছে" বলেই আনন্দবাজারদের 'আশ্রয়' কংগ্রেস সভাপতি সনিয়া গান্ধীর বকলমা শাসনে ভারত সরকার 'ধর্মনিরপেক্ষতার স্বর্গভূমি' ভারতবর্ষে দরিদ্র হিন্দুদের বঞ্চি ত করে ধর্ম বিশেষ মুসলিম এবং ইদানীং বিশেষভাবে খৃস্টান সমাজের পদলেহন করে চলেছে কেবল আনন্দবাজারের উল্লিখিত 'ভোটের' দিকে চোখ রেখেই। আনন্দবাজার-কংগ্রেস সিপিএম সহ কোনও রাজনৈতিক দলেরই এইসব দিকগুলিকে নিরুৎসাহিত করে না পরন্তু বিজেপি'র সম্পর্কে এরকম কোনও সামান্য বিষয় পেলেও অভূতপূর্ব লেখন-দক্ষতা, অসীম সত্যবিকৃতি এবং অপরিসীম উৎসাহে সেই বিষয়টিকে বারেবারে নানান কৌশলে তা পাঠক-দরবারে পরিবেশন করে। সাম্প্রতিক কালপর্বে ব্যতিক্রম বিশেষে সাংবাদিকতা যেমন কিছু কামিয়ে নেবার ব্যবসায়ে পর্যবেশিত হয়েছে, রাজনীতিও ইদানীং সমস্ত ব্যতিক্রম সত্বেও একটি বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে।.... কিন্তু, সব ব্যবসায় বা বৃত্তির মধ্যেই যেমন একটি এথিক্স্ (বা নীতি) কিম্বা একটি ট্রুথ (বা সত্য) থাকে, আনন্দবাজারদের সাংবাদিকতায় এবং বিজেপি'র রাজনীতিতেও তেমনি একটি এথিক্স বা ট্রুথ আছে। আনন্দবাজার জাতীয় সংবাদপত্রের 'সত্য' নিয়ে আলোচনার আগে বিজেপির রাজনীতির নৈতিকতা ও নীতি নিয়ে কথাটা সেরে নি।

বিজেপির রাজনীতির 'সত্য'-টি হল হিন্দুত্ব, হিন্দুধর্মের রক্ষণ-পরিবর্ধন এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরার পরিপোষণ। আনন্দবাজারের আনন্দ পানপাত্রে ওষ্ঠ ভেজানো বোতলীয় সুবোধ ও নির্বোধ সাংবাদিকেরা বিশেষ স্বার্থে পাঠক সমাজে প্রকাশ করেন না যে, ভারতবর্ষের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত এই অভিমত রেখেছেন যে, এই হিন্দুত্ব এবং ভারতবর্ষের জাতীয়তা সমার্থক এবং আনন্দবাজার কথিত তথাকথিত প্রচলিত ধর্মগুলির নিছক মামুলি মৌলিক সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে আরও ব্যাপকতর অর্থ বোধে সেই হিন্দুধর্মের মর্মার্থ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সর্বোপরি হিন্দুধর্ম হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরায়ত সংস্কৃতি, পরম্পরা, ঐতিহ্য এবং দেশপ্রেম ও স্বদেশবাদিতায় মননে-বাচনে তন্বিষ্ঠ আনুগত্যের অন্য নাম (এভরি ইন্ডিয়ান ইরেসপেকটীভ অব সো-কল্ড রেলিজিয়ন ইজ হিন্দু — যে জাতিরই হোক, প্রত্যেক ভারতবাসীই একজন হিন্দু বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপ্ত হিন্দুসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো এবং কোথাও কোথাও খৃস্টান সমাজের ওপর ধিক্কার মিছিল সামান্য একটা আতঙ্কের পরিবেশও সৃষ্টি করলো। ঘটে যা তা লেখাই যথার্থ সাংবাদিকতার 'সত্য' কিন্তু আনন্দবাজার এবং তজ্জাতীয় সংবাদমাধ্যম ও তাদের মনিব সমাজের কাছে ঘটে যা তা সত্য নয়, যা রটনা হলে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষিত হয় আসল 'সত্য' সেইটাই। তাই আনন্দবাজারের বর্তমান অভিভাবক করাতেরা বজরং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষনার দাবি জানালো, বিদেশি ভ্যাটিক্যানের পোপ সমস্ত রীতি-পদ্ধতি প্রটোকল ভেঙে (ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নয়) তাঁর খৃস্টানী শিষ্যা সনিয়া গান্ধীকে বিষয়টিতে দৃষ্টিদানের অনুরোধমূলক আদেশ করলো এবং আনন্দবাজার তার আনন্দদায়ী পৃষ্ঠায় আচার্য লক্ষ্মণানন্দ এবং স্বামী অমৃতানন্দজীদের পরিকল্পিত হত্যার সংবাদ গোপন করে কেবলমাত্র তথাকথিত একটি সংখ্যালঘু সমাজের ওপর বিজেপি-বজরং দলের সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের সত্য-মিথ্যা নানান খবর লিখলো। দোষ নেই। আনন্দবাজার ব্যবসা করিতে আসিয়াছে এবং যে পথে তাহার কাগজখানির বিক্রি বাড়িবে আনন্দবাজারেরা সেই পথেই তাহাদের ব্যবসা করিবে (রচনার শুরুতে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়ের উদ্ধৃত অংশের অনুসরণে)।....

আরেক দিনের খবর। ১৯৯৯ সাল। কংগ্রেস শাসিত মধ্যপ্রদেশের ঝাঁবুয়ায় চারজন খৃস্টান নান্-কে নাকি গৈরিকবাহিনীর গুন্ডারা ধর্ষণ করলো এবং আনন্দবাজার ওই সালের সমগ্র জানুয়ারি মাস ধরে সেই ধর্ষণের নানারা খবর রসিয়ে রসিয়ে চাটনীর মতো পাঠকের পাতে পরমযত্নে পরিবেশন করলো। অবশেষে মধ্যপ্রদেশ সরকারের তদন্তকার্য ঐ খবরের যথার্থ্যতাকে অস্বীকার করে জানালো যে, ধর্ষকেরা প্রত্যেকেই খৃস্টানধর্ম গোষ্ঠীর লোক ছিল (তাং ৩১।১।৯৯)। হিন্দুস্থান টাইম্স্, নিউজ উইক, অর্গানাইজার ইত্যাদি সংবাদপত্র পরের দিন সেই খবর প্রকাশ করল (১-২-৯৯)। আনন্দবাজারের আনন্দদায়ী সাংবাদিকেরা খুঁজে দেখুন, আনন্দপত্রে দ্বিতীয়বারের এই খবরটিকে তারা তেমনভাবে খুন করতে না পারলেও গুম করে ফেলেছিল। এইভাবে খবরের নামে খাস্তা বানিয়ে আনন্দবাজার তার পাঠক বাজারে বিজেপি'র নামে যত খেউরই করুক — আমরা তাকে খিস্তি করে গাল দিতে চাইনা। কেননা 'আনন্দবাজার ব্যবসা করিতে আসিয়াছে এবং যেপথে কাগজখানিতে বেশি মুনাফা হইবে আনন্দবাজার সেই পথেই ব্যবসা করিবে'।....

আবার আরেক দিনের খবর। কয়েকজন হিন্দু স্বামীজীর সেবায়-আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে মালদায় কয়েকশ ধর্মান্তরিত পশ্চাদপদ অবহেলিত হিন্দু-খৃষ্টান হিন্দুধর্মে বা স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করলো। যেভাবে হোমশিক্ষা ললাটে রাখা হয়, যেভাবে বিবাহাদিতে অগ্নিসাক্ষী করে মন্ত্রপড়া হয় সেইভাবে অগ্নিসাক্ষী রেখে ধর্মান্তরিত মানুষগুলির হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের সেই খবরকে সঠিকভাবে দূরদর্শনে 'খোজখবর' ছবিসহ পরিবেশন করলো। হালকালের গণশক্তি'র সদ্যকালের পার্টনার আনন্দবাজার লিখলো মালদায় খৃস্টানদের জ্বলন্ত আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটলো ভিএইচ পি (আনন্দ বাজার ২৬-৩-৯৯ দ্রঃ)।

কিন্তু, আনন্দবাজার কেন কখনোও লেখে না — "ছোটনাগপুরের খৃস্টানেরা বিচ্ছিন্নতাবাদে সমর্থন জোগাচ্ছে (টেলিগ্রাফ ৫।১।৯৯)। আনন্দবাজার একবারও কেন বলল না-"খৃস্টান মিশনারীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচারে নেমেছে (টেলিগ্রাফ)। আনন্দ বাজার কেন লেখেনা "গুজরাটের দাংসে খৃস্টানরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে" (সানডে অবজারভার - ৩।১।৯৯)। আনন্দবাজার কেন লেখে না "এভাবে সারা দেশে ধর্মান্তরণ চললে শীঘ্রই এদেশ হিন্দুশূন্য হবে" (দ্য স্টেটসম্যান ৪-১-৯৯)।

দোষ নেই। আনন্দবাজার ব্যবসা করিতে আসিয়াছে এবং যেপথে তাহার বিক্রি বাড়িবে আনন্দবাজার সেই পথেই তাহার ব্যবসা করিবে।...

আনন্দবাজার কেন কখনও লেখে না — "ছোটনাগপুরের খৃস্টানেরা বিচ্ছিন্নতাবাদে সমর্থন জোগাচ্ছে (টেলিগ্রাফ ৫।১।৯৯)। আনন্দবাজার একবারও কেন বলল না- "খৃস্টান মিশনারীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচারে নেমেছে (টেলিগ্রাফ)। আনন্দ বাজার কেন লেখে না "গুজরাটের দাংসে খৃস্টানরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে" (সানডে অবজারভার - ৩।১।৯৯)। আনন্দবাজার কেন লেখে না "এভাবে সারা দেশে ধর্মান্তকরণ চললে শীঘ্রই এদেশ হিন্দুশূন্য হবে" (দ্য স্টেটসম্যান ৪-১-৯৯)।

হেঁয়ালির জবাব নেই

(১০ পাতার পর)

আমলার এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বাতিল করাও যায় না। তা হলে কি আমেরিকা ভারতের কাছে তার এ বিষয়ে গুরুত্ব বাড়াতে সন্ত্রাসে মদত দিতে চায় গোপনে? তাতে তো হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশী। এদিকে সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে খোদ পাকিস্তানকেই আমেরিকা আক্রমণ শুরু করেছে। তাহলে কোনও ভাবেই ব্যাখ্যা না পাওয়া ডগলাসের ঘটনাটা কি উদ্ভট হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে না? এরকম দ্বিচারিতার মূর্খতা কি কোনও দায়িত্বশীল দেশের পক্ষে সম্ভব? রাজনীতির অপর নাম কপটাচারিতা হলেও উভয়ের স্বীকৃত স্বার্থের প্রশ্নে তা স্বাভাবিক কি? ভারত সরকার না হয় কাছা খোলা, কিন্তু জনগণ কে গোঁয়ার ও উৎকেন্দ্রিক বলে সুখ্যাতির (?) একটা মুকুট পরা গণতান্ত্রিক আমেরিকা সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে।

নিরুপম মন্ত্রীত্ব ছাড়তে চান

(৫ পাতার পর)

ত্যাগ করেছেন। পার্টি কর্মীদের চিঠি পত্রের স্বীকৃতি পর্যন্ত দেন না। সিপিএম দেওয়াল লিখন এখনও পড়তে পারছে না। তাদের কে শুধু এই কথাটাই শোনাতে চাই — শেষের সেদিন বড়ই ভয়ঙ্কর।

এখন সিপিএম নেতৃত্বের বর্ধমান লবি-মেদিনীপুর নেতৃত্ব আক্রমণাত্মক নীতি না নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী ও গৌতম দেব মনে করেন, আরও কনসেশন দিয়ে সিঙ্গুর-এ মীমাংসা করলে ভাল হত।

এখনও পর্যন্ত নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুর-এ সিপিএম পা-রাখার জমি পাচ্ছে না। এর কারণ ম্যান-মাশল ম্যানি এই নীতি।

এ-কথা নির্দ্ধিধায় বলে দেওয়া যেতে পারে সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এরই মধ্যে বিদ্রোহীমন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার হাত থেকে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা বুদ্ধ বাবু স্বহস্তে রাখছেন। এটি ভবিষ্যতে আরও দ্বন্দ্বের কারণ হবেই। এর ফলে সিপিএম-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পার্টিতে বিশেষ গোলযোগের সূত্রপাত হবে। কারণ রেজ্জাক মোল্লাকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির অধিকাংশ সদস্য সমর্থন করেন।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবাসন মন্ত্রী তথা সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সদ্য উন্নীত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব ঠারেঠোরে বলেছেন যে, বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা না করার জন্য সিঙ্গুরে ঝামেলা হয়েছিল। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, রাজারহাট-নিউটাউনে তৃণমূল-বিজেপি দল নিয়েই কমিটি গঠন করে, সেই কমিটির সুপারিশ মাফিক দরে জমি কেনা হয়। আগামী দিনে গৌতম দেব-ই বুদ্ধ বাবুর কাছে চ্যালেঞ্জ হবেন। আজকে সিপিএম কয়েকজন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবর্গের আলগা সংগঠনে পরিণত হয়েছে, এইসব ব্যক্তি নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং তাঁদের কোটারি ভুক্তদের ধনী করে দেওয়া এবং চাকরি করে দেওয়াতে।

ফিশার, কাসপারভের সমগোত্রে আনন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। 'আনন্দ হল এক বিরল প্রজাতির গ্রান্ডমাস্টার। ও যেভাবে এগিয়ে চলেছে, ভবিষ্যতে ববি ফিশার ইমানুয়েল লাসকার, আলেকজান্ডার আলেখিন, জোস রাউল কাপাব্লাঙ্কার পাশে জ্বল জ্বল করবে হল অব ফেমে'। উন্নাসিক গ্যারি কাসপারভের এহেন স্তুতি যে অমূলক নয় তা প্রমাণ করতে সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব দাবার খেতাব রক্ষার লড়াইয়ের মঞ্চ টিকে যেন বেছে নিয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। বিশ্ব বিখ্যাত যেসব গ্রান্ডমাস্টারের নাম করেছেন গ্যারি, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হয় আজার বাইজানের ধূমকেতু নামে সমধিক পরিচিত মানুষটিও। অন্তত রেকর্ডের নিরিখে গ্যারি তো এদের সকলকে ছাপিয়ে গেছেন। আর সেই রেকর্ড স্পর্শ করার দিকে কৃতসংকল্পবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছেন ভারতরত্ন ভিসি আনন্দ।

মাসখানেক আগেই স্পেনের বিলবাওয়ে এক ১৮ ক্যাটাগরির টুর্ণামেন্টে আনন্দের পদস্থলন দেখে গেল গেল রব উঠে যায় চারদিকে। তবে কি আনন্দ ফুরিয়ে যাচ্ছেন? তার চিন্তা-চেতনা, নিত্য নতুন উদ্ভাবনী কৌশল কি আগের মতো কাজ করছে না? এসব প্রশ্নে দিকভ্রান্ত দাবা সমাজ। বিদেশী দাবা তাত্ত্বিককূল কিন্তু এত সহজেই আনন্দকে খরচের খাতায় ফেলে দেননি। বিদেশী মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা যে জীবনকে অন্য চোখে, অন্য আলোকে দেখেন। আর আমাদের দেশজ দিগগজরা যে সময়ের হিসেবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রায় দিয়ে দেন। সব খেলার ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। স্থান, কাল, ঘটনার নিরিখে যে বস্তুতাত্ত্বিক বিচার করতে হয় খেলা ও খেলোয়াড়দের যে ব্যাপারটা এদের মাথায় থাকে না। আনন্দের সাময়িক পদস্খলন দেখে তাই সূর্যশেখর গাঙ্গুলি বা দিব্যেন্দু বড়ুয়ার মতো দু-চারজন ছাড়া প্রত্যেকেই তার শেষের শুরু দেখতে

বিশ্বনাথন আনন্দ

পেয়েছিলেন। আর বাস্তবে জগৎবাসী কি দেখল — আনন্দ যেন আবার নতুন করে তার দৌড় শুরু করলেন জার্মানির রাজধানী বন থেকে।

রুশ গ্র্যান্ডমাষ্টার ভ্লাদিমির ক্রামনিক বনাম বিশ্বনাথন আনন্দের খেতাবী লড়াই ঘিরে তৈরি হওয়া আবেগ, উন্মাদনা ও রোম্যান্টিক কল্পনা যেন মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল ১৯৭২-র সেই ঐতিহাসিক ববি ফিশার ও বরিস স্প্যাসকির মধ্যে হওয়া 'ব্যাটল রয়ালকে'। গোটা দুনিয়া যেন ওই লড়াইকে ঘিরে দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেছিল। ঠান্ডা লড়াইয়ের আঙ্গিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন অবশ্য সেরকম কোনও যুযুধান পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিকতার বাতাবরণ নেই। কিন্তু চরিত্র বা চালচিত্রের প্রেক্ষিতে আনন্দ-ক্রামনিক খেতাবী লড়াই সব অর্থেই অন্যমাত্রা পেয়ে যায়। আর এই লড়াইয়ের জন্য আনন্দ যে কতটা তৈরি হয়ে নামে, তার প্রমাণ প্রথম গেম থেকেই পাওয়া যায়। আদ্যন্ত জমাট রক্ষণশীল গ্রান্ডমাস্টার ক্রামনিককে শুরু থেকেই প্রথাবিরোধী চাল দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেয় আনন্দ। প্রথম জয় আসে তৃতীয় গেমে কালো খুঁটি নিয়ে খেলে। এর থেকেই বোঝা যায় তার প্রস্তুতি ও ম্যাচ সিচুয়েশন অনুযায়ী খেলার ছাঁচ ও কৌশল পরিবর্তনের উৎকর্ষতা। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সহ চারজন সেকেন্ড নিয়ে দীর্ঘকালীন যে প্রস্তুতি আনন্দ নিয়েছিলেন স্পেনে বসে তার সুফল ফলতে শুরু করে প্রথম গেম থেকেই। এই চার সেকেন্ডের মধ্যে একজন ছিলেন বাংলার সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। থিওরি ও প্র্যাকটিকাল দুটো দিকেই কোনও খুঁত রাখেননি আনন্দ। বিগত দশ-পনেরো বছরে সংঘটিত সব স্মরণীয় ম্যাচের ভিডিও ফুটেজ দেখে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট রকমের ভ্যারিয়েশন তৈরি করে নেন আনন্দ। ওপেনিং, মিডল, এন্ড গেমে এভাবে খেলতে সাম্প্রতিককালে আননন্দকে দেখা যায়নি। আর ক্রামনিকও যে সে দাবাড়ু নন। সুপার গ্রান্ডমাষ্টার, একবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও বটে। সর্বোপরি তার কাছে হেরেই মানসিক দিক থেকে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গ্যারি কাসপারভ অবসর নিয়ে ফেলেন। এহেন ক্রামনিককে শুরু থেকেই আক্রমনাত্মক খেলে টাইম প্রেসারে ফেলে নাস্তানাবুদ করে হারিয়ে খেতাব তুলে নেওয়া আনন্দের অতিমাত্রিক দক্ষতা ও প্রতিভার প্রতিফলন।

ভেন্টিলেশনে বাংলার ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতীয় ফুটবলের রাজধানী বদল হয়ে গেল। কয়েক বছর ধরেই একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল এই প্রেক্ষাপট বদলের। সবেধন নীলমণি যে কটি ক্ষেত্রে বাংলার গর্ব করার মত অবকাশ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ফুটবল। সেই ফুটবলটাও নিয়ে গেল গোয়া। এমনকি মুম্বাইও, ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও বাংলাকে টেক্কা দিচ্ছে। গত দু-তিন বছর ধরে জাতীয় লিগ হয় গোয়া নয় মুম্বাইয়ে যাচ্ছে আর বাংলার তিন বড় ক্লাব নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে জেতাটাকেই বড় করে দেখে দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক বছর আগেও ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়রা এই তিন প্রধানে খেলতে আসত যশ, খ্যাতি, অর্থপ্রাপ্তির আশায়। অর্থপ্রাপ্তি হয়তো এখনও হয় কিন্তু তুল্যমূল্য

বিচারে নাম, সম্মান কিন্তু বেশি পাওয়া যাচ্ছে ডেম্পো, চার্চিল, মাহিন্দ্র বা জেসিটিতে খেললে। জাতীয় লিগে প্রথম তিন-চারটি দলের খেলোয়াড়রাই যে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রচারের আলোকবৃত্তে থাকেন ও জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পান। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে গেছে কলকাতা মাঠ কি এখনও ভারতীয় ফুটবলের তীর্থ বলে গণ্য হবার যোগ্য? জাতীয় দলে বাংলার খেলোয়াড় হাতে গুনে বলে দেওয়া যায়। জাতীয় লিগ বা ফেডারেশন কাপে চাম্পিয়ন

হচ্ছে গোয়া, মুম্বাইয়ের ক্লাব।

মুম্বাইয়ের সদ্য জন্ম নেওয়া ক্লাব মুম্বাই এফসি এবার জাতীয় লিগে আত্মপ্রকাশ করেই কলকাতার মাঠে এসে ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগানকে হারিয়ে চলে যায়। কেন এমন অবস্থা, অদূর ভবিষ্যতে কি অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়ে যাবে মোহন-ইষ্ট বা মহামেডান স্পোর্টিং? কারণ বিশ্লেষণ করতে বসলে প্রথমে উঠে আসে তিন প্রধান কর্তাদের অদূরদর্শিতার কথা। এখন সব খেলার মত ফুটবলও একটা শিল্প। একে ঠিক মতো মার্কেটিং করতে না পারলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক বাজারে টিকে থাকাই দায়। তাছাড়া পরিকাঠামো থেকে পরিকল্পনা সব ক্ষেত্রেই মান্ধাতার আমলে পড়ে আছে কলকাতার ফুটবল। দর্শকদের চিন্তা-ভাবনা ও মানসিকতাও কূপমুন্ডক ধরনের। অন্যদিকে গোয়া ও মুম্বাই — সীমাবদ্ধ তার মধ্যেও ঠিকঠাক কাজ করে কলকাতার হাত থেকে ব্যাটন কেড়ে নিয়েছে।

শব্দরূপ - ৪৮৪

গোখেল বড়াল

১	■	২		৩	■	৪	■
	■		■	৫			■
৬			■		■		■
	■	■	■	■	৭		৮
৯	১০		■	■	■	■	
■		■	১১	■	১২		
■	১৩			■		■	
■		■	১৪			■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. প্রাথমিক গুণনের ধারাবাহিক তালিকা, ৫. মাটির বড় সরা, প্রথম দুয়ে পণ্য, ৬. বিলিতি মর্মর প্রস্তর, বাচ্চাদের খেলার ছোটগুলি বিশেষ, ৭. রবি ঠাকুরের মালঞ্চ উপন্যাসের একটি নারী চরিত্র, শেষ দুয়ে বড় গাছের গুঁড়ি, ৯. এজমালি, একাধিক অংশীদার, ১২. বর্ণমালার লেখা সংকেত, অক্ষর, প্রথম দুয়ে মহাদেব, ১৩. এমন একটা — খুঁজে পেলাম না ....." পুরনীয় স্থানে শুক্তি, ১৪. নূন।

উপর-নীচ ঃ ১. ভূগোলে এক কাল্পনিক কৌণিক রেখার দীর্ঘতা, ২. প্রতিশব্দে হয়রান, হেনস্তা, বিশেষণে জব্দ, ৩. পরিহাস, ঠাট্টা, কৌতুক, ৪. মাদকসেবী, প্রথম দুয়ে আসক্তি, ৮. ইঙ্গ শব্দে জাহাজ সংলগ্ন যাত্রীদের জীবনরক্ষার্থে ব্যবহৃত ছোট দ্রুতগামী নৌকাবিশেষ, ১০. নূপুরের বা সেতারাদি তারযন্ত্র ইত্যাদির ঝংকার, ১১. প্রতিশব্দে শৃঙ্খল, নিগড়, বেড়ি, ১২. "তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার — চাই"।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮২

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬

র	■	ও	বা	মা	■	হা	■
ঙ	■	জ	■	দা	মা	মা	■
ম	ন্ম	ন	■	র	■	গু	■
হ	■	■	■	■	খ	ড়ি	কা
ল	ল	না	■	■	■	■	লা
■	শ	■	মে	■	কু	নী	তি
■	ক	ফি	ন	■	ডু	■	পা
■	র	■	কা	জ	ল	■	তা

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৭ নভেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

সমাবেশ সমাচার

প্রয়াত রাম অবতার গুপ্তার স্মরণসভা

হিন্দী দৈনিক 'সন্মার্গ' পত্রিকার সম্পাদক রাম অবতার গুপ্তার মৃত্যুতে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করে রাজস্থান পরিষদ। পরিষদের সভাপতি যুগল কিশোর জৈথলিয়া প্রয়াত গুপ্তার ধর্মপ্রাণ ও সংঘর্ষময় জীবনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তাঁর মৃত্যুতে সমাজের অভাবনীয় ক্ষতি হল। পরিষদের অনান্য কার্যকর্তারাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সিকিমে হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র

ডাঃ হেডগেওয়ার দাতব্য হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র-এর সিকিমের সোরেঙ শাখার উদ্যোগে গত ১৩ ও ১৫ সেপ্টেম্বর দুটি স্থানে নিঃশুল্ক হোমিও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবির দুটিতে সাধারণ মানুষ তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। শিবিরে সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবাপ্রমুখ গৌতম সরকার সহ স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুরে রক্ত দিয়ে শস্ত্র পূজা

নিজেদের রক্ত দিয়ে শস্ত্র পূজা করল স্বয়ংসেবকরা। শক্তি আরাধনা তথা বিজয়া দশমী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে মেদিনীপুর নগরের শিবাজী শাখার স্বয়ংসেবকরা রক্ত দিয়ে শস্ত্র পূজা করে। এদিন অস্ত্র পূজার পাশাপাশি কবাডি প্রতিযোগিতাও হয়। মেদিনীপুর জেলা সঙ্ঘচালক চন্দন কান্তি ভুঁঞা উৎসবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

মেদিনীপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মসভা

গত ১৪ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ভারতমাতা পূজা ও এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বিকালে ধর্মসভার উদ্বোধন হয় বন্দেমাতরম্-এর সমবেত গানের মধ্য দিয়ে।

স্বপন ঘোষ, প্রদ্যোত সাহু, স্বপন বসু, কনক পানিগ্রাহী, অনল পন্ডিত প্রমুখ বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সন্ত্রাসবাদ ও সিমির কার্যকলাপের প্রতি সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

বড়বাজার লাইব্রেরীর নবনির্বাচিত সমিতি

১০৮ বছরের পুরনো ঐতিহ্যমন্ডিত বড়বাজার লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা কলকাতার বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় ২০০৮-২০০৯— জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মসমিতি গঠিত হয়েছে।

সভাপতি — বিমল লাট, সহ সভাপতি — মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল, সচিব-আপ্তসহায়ক — যোগপাল গুপ্তা, সহ সচিব — শ্রীমতী কুসুম লুন্ডিয়া।

এছাড়া কার্যসমিতির সদস্য হিসাবে রয়েছেন — যুগল কিশোর জৈথলিয়া, অশোক কুমার লাখোটিয়া, গুরুপদ বিশ্বাস, হকিকত রায় কপুর, ডঃ প্রেমশংকর ত্রিপাঠী, শ্যামলাল ডোকনিয়া, শম্ভু প্রসাদ আগরওয়াল, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, পবন জৈন, শ্যামসুন্দর বাঁগড়, নন্দ কুমার লড্ডা, দেবকীনন্দন তোদী, চন্দ্রশেখর আগরওয়াল, বিরাট শর্মা, চন্দ্র কুমার জৈন, জয়প্রকাশ আগরওয়াল, বিনোদ দীক্ষিত, সুভাষ বাচ্ছাওয়াত, রাজেশ বাজাজ, অরুণ বাজোরিয়া, সুশীল বগড়িয়া, সুনীল মোর, শ্রীমতী বিমলা মিশ্র প্রমুখ। এছাড়া লেখ পরীক্ষক (অডিটর) হিসাবে অনিল ভন্ডাবেয়লার নাম প্রস্তাবিত হয়।

দুর্গাপুর বি বি পরিষদের প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২১ ও ২২ দুদিন ধরে দুর্গাপুর নগরের ভিড়িঙ্গী কালীবাড়িতে বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে এক সংস্কার প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ বর্গের উদ্বোধন করেন কালীবাড়ির সেবায়েত সাধন কুমার রায়। শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের যোগ ব্যায়াম সহ ইতিহাস, ইংরেজি ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে, স্কুল-ছুটদের সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, গুরুদাস মন্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত ডাঃ সুজিত ধর-এর স্মরণসভা

গত ১৬ অক্টোবর বাঁকুড়ার পাঞ্চ জন্য ভবনে প্রয়াত ডাঃ সুজিত ধরের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া শহরের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। এক মিনিট নীরবতা পালন, শান্তি মন্ত্র, গীতা পাঠ, প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বক্তারা নষ্টালজিয়ার গভীরে প্রবেশ করেন। শ্রদ্ধেয় সুজিতদা ডাক্তারী পাশ করে জীবনের মহামূল্যবান সময়ের কয়েক বছর বিভাগ প্রচারক হিসাবে বাঁকুড়ায় থাকেন। এই সময় মলবোনা শাখায় গরুর গাড়ি চালিয়ে বনভোজন করতে যান। কিভাবে চৌম্বুকীয় আকর্ষণে স্বয়ংসেবকদের তিনি আকর্ষণ করতেন, কীভাবে তিনি রুগী দেখতেন ইত্যাদি হারিয়ে যাওয়া বিষয় আবার নতুন করে ফিরে আসে।

মোহন চট্টোপাধ্যায়, অবনী মন্ডল, অনাদি কুণ্ডু, ডাঃ সুভাষ সরকার প্রমুখ স্মৃতিচারণ করেন।

পরলোকে সমাজসেবী জ্যোতির্ময় মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা থানা এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী জ্যোতির্ময় মণ্ডল ২ অক্টোবর শিবানীপুর নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনি বর্তমান।

তিনি ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এলাকার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কালীপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে। ১৯৪৫-এ মহাত্মা গান্ধীর ডায়মণ্ডহারবার আগমন উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং এতে তিনি সফলও হন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন স্বয়ংসেবক হিসাবে এলাকায় বহু জনহিতকর কাজ করেন। স্বয়ংসেবক হিসাবে তিনি রামমন্দির আন্দোলন, শিলা পূজন, একাত্মতা যজ্ঞযাত্রা, রাম জানকী রথ প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এছাড়াও নির্দল প্রার্থী হিসাবে তিনি দু'বার ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হন।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাজস্থান পরিষদের বার্ষিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। শার্দুল সিংহ জৈন সর্বসম্মতিতে দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতির পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সহ-সভাপতি হিসাবে যুগল কিশোর জৈথলিয়া, সুন্দরলাল দুগড়, নন্দনলাল শাহ ও পরশুরাম মুন্দ্রা-র নাম ঘোষিত হয়েছে। অনান্য কার্যকর্তাদেরও এই একই সঙ্গে দায়িত্ব ঘোষণা করা হয়।

ললিতাদেবী শিশু মন্দিরের নতুন সম্মান

কলকাতার বিরাটির ললিতাদেবী সরস্বতী শিশুমন্দির এবার নতুন সম্মানে ভূষিত হল। দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান তাদের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ললিতাদেবী শিশু মন্দিরকে বেছে নিয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা নিখরচায় সংস্কৃত শিখতে পারবে। শিক্ষার সমাপ্তিতে তাদের স্বীকৃত সার্টিফিকেটও প্রদান করা হবে। সংস্কৃত শিক্ষার এই কেন্দ্রের উদ্বোধনে সাধারণ মানুষও আনন্দিত। তাদের অনেকের মতে এতে সংস্কৃত চর্চার প্রসার বাড়বে। তারা বিদ্যাভারতীর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বালুরঘাটে দুর্গা পুজোর সময় স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত বুক স্টল।

বেহালায় বুক স্টল।

Swastika
3 November - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

ডাঃ সুজিত ধর চিরদিনই স্বয়ংসেবকদের অনুপ্রাণিত করবেন ঃ মোহন ভাগবত

কলকাতার কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত ডাঃ সুজিত ধরের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন মোহন ভাগবত।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ডাঃ সুজিত ধর স্বয়ংসেবক ছিলেন। এমনিতে তো কেউ একদিন শাখায় ধ্বজপ্রণাম করলেই স্বয়ংসেবক। কিন্তু আমরা সবাই জানি, স্বয়ংসেবকত্ব এক বিশেষ জীবনের নাম। গত ২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় কলকাতার কেশবভবনে প্রয়াত ডাঃ সুজিত ধরের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একথা বলেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ডাঃ ধরের উপস্থিত আত্মীয়স্বজন, কন্যা সুপ্রদীপ্তা ও অন্য সকলের প্রতি সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানান। তিনি বলেন, ডাঃ সুজিত ধরকে নাগপুরে প্রতিনিধি সভার বৈঠকে দেখতাম। তখন ওই বৈঠকে প্রবন্ধক হিসেবে আসতাম। পরে প্রচারক, প্রান্ত প্রচারক হয়ে কাছ থেকে দেখা ও মেলামেশা করার সুযোগ হয়েছে। তখনই বুঝেছি উনি অত্যন্ত মেধাবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। সকলের কথা শুনে বুঝতে পারছি, উনি এতবড় প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে সর্বস্তরে সমানভাবে মেলামেশা করতেন। জীবনে সঙ্ঘচিন্তা ছাড়া অন্য কিছু লক্ষ্য ছিল না। সেজন্য কখনও কারও সূচনা বা উপদেশ নয়, নিজে থেকে স্বাভাবিকভাবেই করতেন। এককথায় বলা যায়, সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী জীবনের শেষ সময়ে ডাক্তার থেকে সকল কার্যকর্তাদের নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে আগত স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গুরুজীর শেষ প্রবাসের সময় বিমান নামতে না পেরে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় — স্বয়ংসেবক ডাক্তার সুজিত ধরের সঙ্গে দেখা করার জন্যই। এটাও সেরকমই। সুজিত দা তাঁর আপন দুর্লভ প্রতিভার জন্যই সর্বস্তরে সমাদৃত ছিলেন। যাতায়াত যোগাযোগও ছিল। তিনি নেই। কিন্তু তাঁর স্বয়ংসেবকত্ব অমর। যা চিরদিন সকল স্বয়ংসেবকদের অনুপ্রাণিত করবে। এদিন কেশব ভবনে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার সূত্রপাত করেন কলকাতা মহানগর কার্যবাহ সুশীল রায়। তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে সুজিতদার সাহচর্যের অনেক পুরনো ঘটনার উল্লেখ করেন। তারপর ডাঃ ধরের একান্ত ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ মোতিলাল সোনী অনেক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেন। ক্ষেত্র প্রচারপ্রমুখ অসীম কুমার মিত্র বলেন, সুজিতদার কলকাতা তথা দেশের অনেক বিদগ্ধ চিন্তাশীল নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এজন্য ডাঃ ধর এক আলাদা প্লাটফর্ম 'যোগক্ষেম' কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও যোগক্ষেমের মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন। বস্তি থেকে বহুতল সকল এলাকার স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত যোগাযোগ সম্পর্ক বজায় রাখতে ডাঃ ধরের তুলনা ছিলনা। বিপরীত চিন্তাধারার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজের বাকপটুতা ও প্রভাবী ব্যক্তিত্বে স্বপক্ষে

ডাঃ সুজিত ধর

আনতে পারতেন ডাঃ ধর, যে কারণে যোগাযোগ ও কথাবার্তা বলায় ডাক্তারজীর (সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা) জন্মশতবর্ষে কলকাতার অতি বাম মনোভাবাপন্ন 'আজকাল' পত্রিকায় ডাক্তারজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ষ প্রতিপদার দিনই প্রকাশিত হয়েছিল।

সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তব্যবস্থা প্রমুখ শিবভগবান ঝগাড়িয়া তাঁদের পরিবারের অকৃত্রিম বন্ধু, স্বজন ও চিকিৎসক বলে ডাঃ ধরের কথা উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত লেখক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহের (রোগ শয্যায়) চিঠি পড়ে শোনান তুষারকান্তি মজুমদার। এছাড়াও স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং দক্ষিণ অসমের প্রান্ত প্রচারক বলরাম দাসরায়। শেষে স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ী সকলে ডাঃ ধরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক কালিদাস বসু এবং জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী।

যা কেউ বুঝতে চাইল না.....

নবকুমার ভট্টাচার্য।। এখানেও আমরা আর ওরা। আমাদের আর ওদের। সমতলের আর পাহাড়ের। দুটো পৃথিবী। বাঙালির আর নেপালির। বাঙালির কাছে দার্জিলিং এক অবদমিত চেতনার মুক্তি। বাঙালির কাছে দার্জিলিং মানে টাইগার হিল। দার্জিলিং মানে মেঘ এর পরে মেঘ দেখার মেলা, দার্জিলিং মানে কমলালেবু আর কাঠের বাক্সে সুগন্ধী চা। অথচ অনেকেই জানেন না ভানুভক্তের নাম। তিনি শুধু নেপালি ভাষার জাতীয় মহাকবিই নন। প্রথম কবি। আসলে দার্জিলিং আমাদের ভালো লাগে, দার্জিলিং কে আমরা ভালোবাসিনা। আর এজন্যই শোনা যায় 'সাতটা দিন, আর সাতটা দিন যদি টুরিস্ট মুভমেন্ট আকটানো যায় তবে ওই পাহাড়িরাই বিমল গুরুং-এর চামড়া তুলবে। পাল্টা আঘাত আসলেই ওইসব গোর্খাল্যাণ্ড মোর্খাল্যাণ্ড মাথায় উঠবে।' দার্জিলিং-এর লোকদের আমরা গোর্খা দরোয়ান ছাড়া আর কিছু ভাবতে শিখিনি। দার্জিলিং-র প্রশান্ত তামাংকে তো আমরা আমাদের রাজ্যের প্রতিনিধি বলে ইন্ডিয়ান আইডল এ সমর্থন করিনি, ভিন রাজ্যের প্রতিযোগী অমিত পালের জন্য গলা ফাটিয়েছি বাঙালি বলে। আমরা নিজেরাই ওদের আমাদের লোক বলে ভাবতে পারিনি। তাহলে মিছিমিছি ওদের দোষ দেওয়া কেন? দার্জিলিং-এ পাহাড়ি নদীর খরস্রোতে টারবাইন চালিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় দশ মেগাওয়াট, তার আট চলে আসে সমতলে আর দার্জিলিং এর পাহাড়ের কোণেকোণে গ্রামগুলো থেকে যায় বিদ্যুৎবিহীন।

এই অঞ্চলে নামকরা কয়েকটা চা বাগান আছে। মকাইবাড়ি থেকেই সবচেয়ে দামি চায়ের জোগান যায় বিশ্ববাজারে। কিন্তু তাতে পাহাড়ের মানুষের তেমন উন্নতি হয় না। দার্জিলিং-এর অনেক সমস্যা — জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেখানকার ভাষার প্রতি উদাসীনতা। রাজনীতির লোকেরা সুভাষ ঘিসিং, বিমল গুরুংদের তোল্লা দিয়ে ভোট

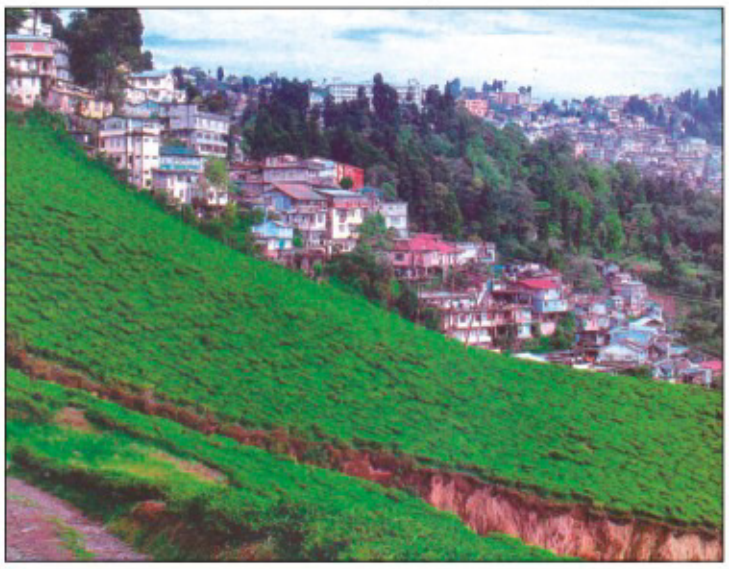

বাগিয়েছেন আর আমরা হারাতে বসেছি দার্জিলিংকে। গোরক্ষভূমিকে বঙ্গভূমি থেকে পৃথক করে নয়, দার্জিলিং-এর প্রকৃত উন্নয়ন প্রয়োজন। দার্জিলিং অঞ্চলে কি একটি গোর্খা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায় না? দার্জিলিং এ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বর্ষাকাল এলেই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সরকারি তরফে ত্রাণ হিসেবে বিলি করা হয় ধুতি ও লুঙ্গি। কয়েক দশক ধরেই এ অবস্থা চলে আসছে কিন্তু পাহাড়ের মানুষ ধুতি ও লুঙ্গি দিয়ে কি করবে? পাহাড়ের গ্রামীণ অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা পশুপালন ও কৃষি। সেখানেও কি তারা সরকারি সাহায্য পাচ্ছে? অধিকাংশ গ্রামে গাড়ি যাতায়াত করার রাস্তা নেই। গোর্খা হিল কাউন্সিল হওয়ার কুড়ি বছর পরেও অবস্থা এতটুকুও উন্নতি হয়নি কেন? গ্রামান্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সারা ভারতে যখন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সংবিধান সম্মতভাবে ত্রিস্তরীয় তখন এখানে তা দ্বিস্তরীয়। তাও এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মেয়াদ ২০০৫ সালে শেষ হয়ে গেছে। এই যদি অবস্থা হয় তবে দার্জিলিং-এর উন্নয়নের জন্য ভাববে কে? এরপরও কবরে চলে যাওয়া 'আমরা বাঙালি' অথবা ভুঁইফোঁড় জনচেতনা মঞ্চের আড়ালে কারা গোর্খাদের উপর বাঙালিদের লেলিয়ে দিয়ে একটা নিরিহ আন্দোলনকে জাতিদাঙ্গার দিকে ঠেলে দিল? সারা রাজ্যজুড়ে যারা গোর্খাদের ভারত থেকে বহিস্কারের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে, তারা কেন ভারত থেকে সন্ত্রাসী মুসলমান জঙ্গীদের বহিস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয় না!

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com